২য় অধ্যায়ঃ নৈতিক, আদর্শিক ও বিশ্বাসগত ফরজসমূহ

প্রারম্ভিক কথাঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলামে যেমন বাস্তব অনুশীলন বা কর্ম রয়েছে। তেমনি রয়েছে বিশ্বাসগত দিক, রয়েছে নৈতিক ও আদর্শিক দিক। ইসলামের নৈতিক, আদর্শিক ও বিশ্বাসগত বিষয়গুলোকে একত্রে বলা হয় ঈমান আর বাস্তব অনুশীলনকে বলা হয় আ'মাল। ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈমান ছাড়া আমল মূল্যহীন হয়ে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)

যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী; সে যদি মুঅমিন হয় তবে আমি অবশ্যই তাকে (আখেরাতে) উন্নত জীবন দান করব, তাদেরকে দান করব তাদের কাজ অপেক্ষা অনেক উত্তম প্রতিদান। (১৬ আল-নাহ'লঃ ৯৭)

জ্ঞাতব্যঃ সৎকাজ করলেই ছাওয়াব পাওয়া যায় না। সৎকাজের ছাওয়াব পেতে হলে কিছু শর্ত পূরন করতে হয়। এসব শর্তের প্রথমটি হল ঈমান। (এসব শর্ত সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ২য় এবং ৩য় বই দেখে নিন)

ইসলামে নৈতিক ও আদর্শিক বিষয়সমূহের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)

তবে যে ব্যক্তি তাওবাহ করল (কুফর শিরক থেকে ফিরে এলো) ঈমান আনল এবং নেক কাজ করল; আল্লাহ তাদের মন্দ (অবস্থা)কে ভালোয় রূপান্তরিত করে (সাজার বদলে পুরস্কার) দেবেন নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২৫ ফুরক্বানঃ ৭০)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে ৩টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছেঃ তাওবাহ, ঈমান এবং সৎকাজ। এরমাঝে..

- তাওবাহ ইসলামের নৈতিক ও আদর্শিক দিক। কুফর, শিরকসহ পাপের পথ ছেড়ে ইসলামের/পূন্যের পথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলা হয়।
- ঈমান ইসলামের বিশ্বাসগত দিক। আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় তথ্য, বিধান ও বিষয়াদির উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু বিশ্বাস না করা, এসব হচ্ছে ঈমানের মূল বিষয়।
- আমল ইসলামের অনুশীলনীয় দিক। নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নিয়ে বাস্তবে মেনে চলার নাম আমল।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)

..হে রাব্ব! তুমি আমাকে এবং আমার বাবা-মাকে যে নিয়ামত দান করেছ এর শোকর আদায় করার সামর্থ্য আমাকে দান কর! আমি যেন সৎকাজ করে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি। (হে প্রভু) আমার সন্তানদেরকেও সংশোধন করে দিও। (সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা ও দুনিয়ার মোহ বিসর্জন দিয়ে) আমি তোমার কাছে তাওবাহ করেছি (ফিরে এসেছি) আর যারা তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে আমি তাদের কাতারে শামিল হয়েছি। (৪৬ আহক্বাফঃ ১৫)

উল্লেখ্য উক্ত আয়াতে জান্নাতী মানুষের ৫টি বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে। যথাঃ

- নিয়ামতের শোকর আদায় করা,
- নেক আমল করা,
- নিজেকে সংশোধন করা,
- তাওবাহ করা তথা যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে ফিরে আসা
- এবং আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

উল্লেখিত ৫টি বৈশিষ্টের মাঝে ৪টিই নৈতিক ও আদর্শিক। এভাবে আল-কুরআনের আরো অনেক আয়াতে নৈতিক ও আদর্শিক বিষয়াদির প্রতি অতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তাই মুসলিম হিসেবে যেসব নৈতিক ও আদর্শিক বিষয়কে আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে এসব বিষয় নিয়েই আমরা এ অধ্যায়টি সাজিয়েছি। তাই আসুন! জেনে নেই এ বিষয়গুলো কি কি? সহজভাবে বুঝার সুবিধার্থে এ অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। আর তা হচ্ছে..

অনুচ্ছেদঃ ১. তাওবাহ বা ফিরে আসা
অনুচ্ছেদঃ ২. ত্বাগূত বর্জন
অনুচ্ছেদঃ ৩. ইসলাম গ্রহণ
অনুচ্ছেদঃ ৪. তাযকিয়্যাহ
অনুচ্ছেদঃ ৫. ঈমান
অনুচ্ছেদঃ ৬. ঈমানের উপর অবিচল থাকা
অনুচ্ছেদঃ ৭. তাকওয়া
অনুচ্ছেদঃ ৮. ইহসান

অনুচ্ছেদঃ ৯. সবর
অনুচ্ছেদঃ ১০. শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ
অনুচ্ছেদঃ ১১. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা
অনুচ্ছেদঃ ১২. দুনিয়ার উপর দ্বীন ও আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া

অনুচ্ছেদঃ ১. তাওবাহ

প্রারম্ভিক কথাঃ আমাদের যেসব নৈতিক ও আদর্শিক বিষয় ফরজ করা হয়েছে এসবের অন্যতম একটি হলো তাওবাহ। প্রতিটি মানুষ ও জিনের উপর সর্ব-প্রথম ফরজ দায়িত্ব হলো তাওবাহ করা তথা সকল প্রকার কুফর, শিরক, পাপাচার ও ত্বাগূতকে বর্জন করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন।

তাওবাহ পরিচিতিঃ তাওবাহ অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। তাওবাহ আসলে একটি নৈতিক ও আদর্শিক বিষয়, তবে বাস্তব কাজেও এর প্রতিফলন লক্ষনীয়। ইসলামের পরিভাষায় কুফর শিরক ও পাপের পথ ত্যাগ করে ইসলাম, ঈমান ও পূণ্যের পথে ফিরে আসার নাম তাওবাহ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71)

যে ব্যক্তি তাওবাহ করল (অর্থাৎ যাবতীয় কুফর শিরক ত্যাগ করে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে ইসলামের পথে ফিরে এলো) আর সৎকাজ করল; সে আসলে আল্লাহর কাছেই ফিরে এলো আর এটা-ই প্রত্যাবর্তনের সঠিক জায়গা। (২৫ ফুরক্বানঃ ৭১)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে তাওবাহ শব্দটি বিভিন্ন ক্রিয়া পদে রূপান্তরিত হয়ে ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ১ম বার আমরা অর্থ করেছি "তাওবাহ করল" মানে যাবতীয় কুফর শিরক ত্যাগ করে আদর্শগতভাবে ইসলামের পথে ফিরে এলো, ২য় বারে অর্থ করেছি "ফিরে এলো" আর ৩য় বারে অর্থ করেছি "প্রত্যাবর্তনের সঠিক জায়গা"।

তাওবাহর পদ্ধতি ও প্রকার ভেদঃ সকল প্রকার মন্দ কাজ ও মন্দ পথ ত্যাগ করে তথা মন্দ থেকে ফিরে এসে আদর্শগত ভাবে ভালো হয়ে যাবার নাম তাওবাহ। মন্দের অনেক প্রকার রয়েছে। তাই তাওবাহ বা ফিরে আসাও অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন..

- এক প্রকার তাওবাহ হচ্ছে শিরক ছেড়ে ইসলামের পথে ফিরে আসা। এটা একটা নৈতিক ও আদর্শিক বিষয় তথা জীবনের আদর্শিক পরিবর্তন। (ইসলাম গ্রহণের আগে এমন তাওবাহ করতে হয় এবং ইসলাম গ্রহণের পরও এটা অব্যাহত রাখতে হয়।)
- এক প্রকার তাওবাহ হচ্ছে কুফর ছেড়ে ঈমানের পথে ফিরে আসা। এটাও নৈতিক ও আদর্শিক তাওবাহ তথা জীবনের আদর্শিক পরিবর্তন। (যে তাওবাহ করতে হয় ইসলাম গ্রহণের আগে এবং ইসলাম গ্রহণের পরও এটা অব্যাহত রাখতে হয়।)
- আরো এক প্রকার তাওবাহ হলো পাপ ছেড়ে পূণ্যের পথে ফিরে আসা। (যেহেতু আমরা প্রতিনিয়ত-ই পাপ করি তাই সারা জীবন এমন তাওবাহ অব্যাহত রাখতে হয়)
- সকল প্রকার মন্দকে বিসর্জন দিয়ে সৎপথে ফিরে আসা হচ্ছে সার্বিক তাওবাহ। (এমন তাওবাহ প্রতিনিয়তই করতে হয়)

আমাদেরকে কোন ধরণের তাওবাহ করতে হবেঃ মুঅমিন হতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে আমাদেরকে সকল প্রকার তাওবাহ-ই করতে হবে। প্রথম তাওবাহ হচ্ছে কুফর শিরক ছেড়ে ইসলাম ও ঈমানের পথে ফিরে আসা। ইসলাম গ্রহণের আগেই প্রথমে কুফর শিরক পরিত্যাগ করতে হবে এবং কুফর ও শিরকের সকল পথ পরিহার করে ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে এবং জীবন আদর্শ হিসেবে একমাত্র ইসলামকেই মেনে চলতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে...

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)

তবে যেব্যক্তি (কুফর শিরক থেকে) তাওবাহ করল, ঈমান আনল আর (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করল আল্লাহ তাদের মন্দকে ভালোয় রূপান্তরিত করে দেন (সাজার বদলে পুরস্কার দেন) আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল দয়াময়। (২৫ ফুরক্বানঃ ৭০)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় প্রথমে এসেছে তাওবাহ, তারপর ঈমান, তারপর সৎকাজ। অর্থাৎ প্রথমে কুফর শিরক পরিত্যাগ করে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে, তারপর ঈমান আনতে হবে, তারপর সৎকাজ করলে এসব কাজ ফলপ্রসূ হবে, ইন শা-আল্লাহ।

পর্যালোচনাঃ মুঅমিন হতে হলে প্রথমে তাওবাহ করতে হবে। এ তাওবাহ হচ্ছে কুফর শিরক পরিত্যাগ করে ইসলামের পথে ফিরে আসা আর এতা হচ্ছে বাস্তব জীবনের আদর্শগত পরিবর্তন। তবে মুঅমিন হয়ে গেলেও তাওবাহ শেষ হয় না বরং মুঅমিন হবার পরও তাওবাহ অব্যাহত রাখতে হয়। কারণঃ শয়তান ও নাফসের (অশুভ আত্মার) ধোঁকায় পড়ে পাপ করা মানুষের স্বভাব। স্বভাবগত কারণেই মানুষ বারবার পাপে জড়িয়ে পড়ে। মানুষ কখনো জেনে বুঝে পাপ করে, কখনো না জেনে। তাই জানা অজানা সকল প্রকার পাপের জন্য বারবার তাওবাহ করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর, নাসুহা তাওবাহ (যে তাওবাহর পর আর পাপ করা হয় না এমন তাওবাহকে বলা হয় নাসুহা' তাওবাহ তথা বিশুদ্ধ তাওবাহ। এমন করলে) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে

দেবেন আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে কত নহর। আল্লাহ সেদিন নবীকে অপদস্থ করবেন না এবং তাদেরকেও (অপদস্থ করবেন না) যারা নবীর (আদর্শিক) সঙ্গী হয়ে ঈমান গ্রহণ করেছে। (সেদিন) তাদের (ঈমান আমলের) নূর তাদের সামনে ও ডানে চলমান থাকবে (অন্তর থেকে বের হবে ঈমানের নূর আর ডান দিক থেকে বের হবে আ'মালের নূর।) তারা বলবেঃ হে রাব্ব! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে মহাক্ষমতাবান। (৬৬ তাহরীমঃ ৮)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

..হে মুঅমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবাহ কর তথা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো! এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (২৪ নূরঃ ৩১)

প্রাসঙ্গিক কথাঃ ইস্তিগফারঃ তাওবাহ করার পরপরই ইস্তিগফার করতে হয়, ইস্তিগফার হচ্ছে তাওবাহ'র সম্পুরক বা সহযোগী বিষয়। ইস্তিগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা, মাফ চাওয়া। নিজের পাপ স্বীকার করে নিয়ে পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াকে ইস্তিগফার বলা হয়। তাওবাহর পরপরই ইস্তিগফার করতে হয়। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	..তোমরা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২/১৯৯)

তাওবাহ করার পর আমাদের করনীয়ঃ তাওবাহ ও ইস্তিগফারের পর (তথা পাপ ও পাপাচার ছেড়ে সৎ পথে ফিরে আসার এবং পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার পর) আমাদের জীবনকে নৈতিক, আদর্শিক ও কর্মগতভাবে সম্পূর্নরূপে বদলে ফেলতে হবে। যথা..

- নিজেকে সংশোধন করে নিতে হয়,
- পাপ, পাপাচার ও পাপের পথ সম্পূর্নরূপে পরিত্যাগ করতে হয়,
- নৈতিক ও আদর্শিকভাবে ভালো হয়ে যেতে হয়,
- কর্মগতভাবে ভালো পথে চলতে হয় এবং সৎকাজ করতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90)

তোমরা প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু চরম দয়াময়, স্নেহময়। (১১ হূদঃ ৯০)

পাপ মোচনের উপায়ঃ পাপ মোচনের উপায় হচ্ছে তাওবাহ করার পর পাপ ও পাপাচার ছেড়ে ভালো হয়ে যাওয়া এবং সৎ কাজ করা। ৩টি পূন্য এমন আছে যা অতীতের ছোট বড় সকল পাপকে মোচন করে দেয়। আর তা হচ্ছেঃ ইসলাম, হিজরত আর হাজ্জ। যেমন বর্নিত হচ্ছে..

فلمَّا جعل اللهُ الإسلامَ في قلبي أتيْتُ النَّبيَّ ﷺ فقلتُ يا رسولَ اللهِ ابسُطْ يمينَك لأبايعَك فبسط يدَه فقبضْتُ يدي فقال ما لك يا عمرُو قال أردْتُ أن أشترطَ قال تشترِطُ ماذا قال أن يُغفرَ لي قال أما علمتَ يا عمرُو أنَّ الإسلامَ يهدِمُ ما كان قَبلَه وأنَّ الهِجرةَ تهدِمُ ما كان قبلَها وأنَّ الحجَّ يهدِمُ ما كان قبلَه

মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে আ'মর বিন আ'স্ব রা. বলেনঃ ..আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামকে স্থাপন করলেন আমি তখন নবী সাঃর কাছে এলাম এবং বললামঃ আপনার ডানহাত বাড়িয়ে দিন আমি বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করব। তিনি হাত বাড়ালে আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি বললেনঃ আ'মর, তোমার কী হয়েছে! আমি বললামঃ আমি একটি শর্ত দিতে চাই। তিনি বললেনঃ শর্ত দিতে চাও! কী সেটি..?
আমি বললামঃ আমার অতীতের সকল পাপ মাফ করে দেওয়া হোক। তিনি বললেনঃ তুমি কি জানো নাঃ ইসলাম অতীতের সকল পাপকে বিনাশ করে দেয়, হিজরত অতীতের সকল পাপকে বিনাশ করে দেয় এবং হাজ্জ অতীতের সকল পাপকে বিনাশ করে দেয়?.. (মুসলিমঃ ১২১)
উল্লেখ্য এসব ছাড়াও কবীরাহ ধরনের পাপসমূহ তাওবাহও ইস্তিগফারের দ্বারা আর ছোটছোট পাপসমূহ অন্যান্য নেক আমলের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাফ হতে থাকে।

অনুচ্ছেদঃ ২. ত্বাগূত বর্জন

কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে তাওবাহ করে আল্লাহর পথে ফিরে আসার পর আমাদের পরবর্তী ফরজ দায়িত্ব হল সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করা। ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত, ত্বাগূত বর্জন একটি নৈতিক ও আদর্শিক ফরজ। সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করে-ই ইসলাম গ্রহণ করতে হয় এবং ঈমানের পথে ফিরে আসতে হয়।

উল্লেখ্য ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের প্রথমটি হল শাহাদাহ তথা সাক্ষ্য দান। ইসলাম গ্রহণ করতে হলে মুখ ও অন্তরের সমন্বয়ে দুটি সাক্ষ্য দিতে হয়। এর প্রথমটি হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল ইসলামে প্রবেশের প্রথম বাক্যটি-ই "লা" দিয়ে শুরু হয়েছে। আরবী শব্দ "লা" মানে নেই। অর্থাৎ প্রথমেই বর্জনের কথা বলা হয়েছে। আর এ বর্জন মানে হল সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করা। আল-কুরআনে কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36)

আমরা (আল্লাহ) প্রত্যেক জাতির কাছেই রাসূল পাঠিয়েছি। (রাসূলগণ বলেছেঃ হে আমার জাতি!) এক আল্লাহর ইবাদাত কর এবং সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন কর। (তবে কোনো কালেই সকল মানুষ রাসূলের কথা মেনে নেয়নি। ফলে) আল্লাহ কাউকে (যারা ত্বাগূত বর্জন করেছে তাদেরকে) হেদায়াত করেছেন আর কারো উপর (যারা ত্বাগূত বর্জন করেনি তাদের উপর) অবধারিত হয়েছে বিভ্রান্তি। সুতরাং! যমীনে বিচরণ কর এবং দেখো! (আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যানকারীদের কি পরিণতি হয়েছে। (১৬ নাহ'লঃ ৩৬) (এখানে সুস্পষ্টভাবে ত্বাগূত বর্জনের কথা বলা হয়েছে এবং সকল রাসূল-ই নিজ নিজ গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতিকে ত্বাগূত বর্জনের কথা বলেছেন।)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে..

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

দ্বীন গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে) বিভ্রান্তির (ধূম্রজাল) থেকে হেদায়াত সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন যেব্যক্তি সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনল সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৬)

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ মুসলিম হতে বা ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না তবে মুসলিম হওয়ার পর অবশ্যই ফরজ দায়িত্বসমূহ আদায় করতে হবে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

একটি ভুলের অবসানঃ আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে, দ্বীনহীন কিছু মানুষ অন্যদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখার বাহানা হিসেবে কথাটির প্রচলন করেছে এবং করে যাচ্ছে। আর তা হলো "দ্বীন পালনে কোনো বাধ্যবাধতা নেই"। আসলে কথাটি ভুল। সঠিক কথা হলঃ "দ্বীন গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই"।

ত্বাগূ'ত পরিচিতিঃ ত্বাগূ'ত শব্দটি এসেছে আরবী ত্বুগ'ইয়ান থেকে। ত্বুগ'ইয়ান অর্থ অবাধ্যতা। সেমতে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও অপশক্তিকে ত্বাগু'ত্ব বলা হয়। সবচেয়ে বড় ত্বাগু'ত্ব শয়তান। আল-কুরআনের অনেক জায়গায় ইসলামবিদ্বেষী নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে ত্বাগু'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল-কুরআনে ত্বাগূ'ত শব্দের ব্যবহারঃ আল-কুরআনে ত্বাগূ'ত শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন..

- অনেক জায়গায় ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমন বাক্বারাহঃ ২৫৭, নিসাঃ ৬০)
- অনেক জায়গায় ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও আদর্শ বুঝাতে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমন নিসাঃ ৭৬, বাক্বারাহঃ ২৫৬)
- আবার অনেক জায়গায় মূর্তি ও আনস্বাব বুঝাতে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমনঃ যুমারঃ ১৭, নিসাঃ ৫১)
- আর কিছু কিছু জায়গায় ইসলাম বিরোধী নেতা, শক্তি, মূর্তি, শয়তান ইত্যাদি সব অপশক্তি বুঝাতে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমন নাহালঃ ৩৬, নিসাঃ ৭৬, ইত্যাদি)

তাই আসুন! আমরা সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করি এবং নিজের ঈমানকে হেফাজত করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফিক দান কর। আমীন।।

বিঃ দ্রঃ = ত্বাগূ'ত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো দেখতে হবে। যেমন..

- ত্বাগূত বর্জন করা প্রতিটি মানব ও দানবের ফরজ দায়িত্ব। (দেখুন ১৬ সূরাহ নাহ'লঃ ৩৬)
- ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান কবুল হয় না। (দেখুন ২ বাক্বারাহঃ ২৫৬)
- কোনো প্রকার ত্বাগূতের সাথে নৈতিক বা আদর্শিক সম্পর্ক রাখাও কুফর। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৭)
- কোনো ত্বাগূতকে সমর্থন করাও কুফর। যে ব্যক্তি কোনো ত্বাগূতকে সমর্থন করল আল্লাহ তাকে লা'নত করেন। (৪ নিসাঃ ৫১-৫২)
- ত্বাগূতের বিচার বা শাসন স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া কুফর। (৪ নিসাঃ ৬০)
- ত্বাগূ'তের জন্য যুদ্ধ করা বা ত্বাগূতের পক্ষে সংগ্রাম করাও কুফর। (৪ নিসাঃ ৭৬)
- কোনো ত্বাগূতকে ওয়ালী (মিত্র বা অভিভাবক) বানানো কুফর। (৪ নিসাঃ ১৩৮,১৩৯)
- যে মুসলিম ত্বাগূ'ত বর্জন করল না অথবা কোনো ত্বাগূ'তের সাথে নৈতিক বা আদর্শিক সম্পর্ক রাখল অথবা কোনো প্রকার ত্বগূ'তকে সমর্থন করল অথবা কোনো ত্বাগূ'তের বিচার বা শাসন খুশী মনে মেনে নিল অথবা কোনো ত্বাগূ'তের পক্ষে যুদ্ধ বা সংগ্রাম করল অথবা কোনো ত্বাগূ'তকে ওয়ালী বানাল তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে আর সে হয়ে যাবে চিরজাহান্নামী মুনাফিক।

বিষয়টি আসলে খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর, এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক। নতুবা দ্বীন ও ঈমানের উপর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই বিষয়টিকে আরো স্ববিস্তারে জানার জন্য ত্বাগূত অতিগুরুত্বপূর্ন কিছু বিধান এখানে যুক্ত করে দিলাম।

ত্বাগূত সম্পর্কিত কিছু বিধান

প্রারম্ভিক কথাঃ ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত আর ঈমান জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না আর ঈমান গ্রহণযোগ্য না হলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তাই আসুন! ত্বাগূত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এবং অতি গুরুত্বপূর্ন কিছু বিধান জেনে নেই।

বিধানঃ ১. ত্বাগূত বর্জন করা প্রতিটি মানব ও দানবের ফরজ দায়িত্ব। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36)

আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। (এ বাণী দিয়ে যে) তোমরা সবাই এক আল্লাহর ইবাদাত কর আর সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন কর। (তবে কোনো কালেই সকল মানুষ রাসূলের কথা মেনে নেয়নি। ফলে) আল্লাহ কাউকে (ত্বাগূত বর্জনকারীদেরকে) হেদায়াত করেছেন আর কারো উপর (যারা ত্বাগূত বর্জন করেনি তাদের উপর) অবধারিত হয়েছে বিভ্রান্তি। সুতরাং যমীনে বিচরণ কর এবং প্রত্যক্ষ কর! (আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যানকারীদের কি পরিণতি হয়েছে। (১৬ নাহ'লঃ ৩৬)

বিধানঃ ২. ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান কবুল হয় না। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

দ্বীন গ্রহণে বাধ্য বাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে) বিভ্রান্তি থেকে হেদায়াত সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সকল ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। (বাক্বারাহঃ ২৫৬)

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ মুসলিম হতে বা ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে মুসলিম হবার পর অবশ্যই ফরজ কাজ করতে হবে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে। আর এটা হল "দ্বীন পালনে কোনো বাধ্যবাধতা নেই"। আসলে কথাটি ভুল। সঠিক কথা হলো "দ্বীন গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই"।

বিধানঃ ৩. কোনো ত্বাগূতের বিচার বা শাসন স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া কুফর আর কুফর হলো ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল প্রকার আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60)

তাদেরকে দেখনি? যারা মনে করেঃ তোমার উপর নাযিলকৃত এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত (কিতাব ও বিধানের) প্রতি ঈমান এনেছে আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূতের (ইসলাম বিরোধী নেতাদের) কাছে? অথচ তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল ত্বাগূতকে বর্জন করতে। আসলে (ত্বাগূতের কাছে নিয়ে) শয়তান তাদেরকে সম্পূর্নরূপে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। (৪ নিসাঃ ৬০)

বিধানঃ ৪. ত্বাগূতকে মেনে নেওয়া যেমন কুফর ঠিক তেমনিভাবে কোনো ত্বাগূতকে সমর্থন করাও কুফর। যে মুসলিম কোনো ত্বাগূতকে সমর্থন করল সে মুনাফিক হয়ে গেল ফলে তাকে লা'নত করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51)
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52)

তাদেরকে দেখনি? যাদেরকে (তাওরাত, যাবূর, ইনজীল, ইত্যাদি) কয়েকটি কিতাব দেওয়া হয়েছে, তথাপিও তারা জিবত্ ও ত্বাগুতকে মেনে নিয়েছে আর কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেঃ এরা মুঅমিনদের চেয়ে অধিক সঠিক। (আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান থাকা সত্বেও যারা জিবত ও ত্বাগূতকে মেনে নেয়) আল্লাহ এদের লা'নত করেন। আর আল্লাহ যাদের লা'নত করেন তাদের জন্য তুমি কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। (৪ নিসাঃ ৫১-৫২)

জ্ঞাতব্যঃ কাজটি করেছিল একদল ইয়াহুদ আলিম। মক্কার মুশরিকরা বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর জনসমর্থন ধরে রাখার জন্য এক বিরাট উলামা সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। কায়া'ব বিন আশরাফসহ মদীনার কয়েকজন ইয়াহুদী আলিম এতে যোগদান করেছিল। ইয়াহুদ আলিমরা মক্কাহ সফরে এসে..

- মক্কাবাসীর প্রথামত তাদের মূর্তি, সৌধসহ জাতীয় স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করেছিল। আয়াতে এসবকে জিবত বলা হয়েছে।
- ইয়াহুদ আলীমগণ মক্কার মুশরিকদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল, যারা ছিল ত্বাগূত।
- ইয়াহুদ আলীমগণ মুহাম্মাদ সা. ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বলেছিলঃ এরা বিভ্রান্ত এবং মক্কার লোকেরা এদের চেয়ে সঠিক।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ যেসব আলিম কোনো প্রকার কাফির মুশরিকদের সমর্থন করবে, জিবত ও ত্বাগূতকে মেনে নেবে এবং ইসলামের মুজাহিদদের বিরোদ্ধে ফতোয়া দেবে (যেমনটি আজকাল অনেকেই করছে) আল্লাহ তাদের লা'নত করেন। কোনো মুসলিম ত্বাগূতকে সমর্থন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

লা'নত পরিচিতিঃ লা'নত অর্থ বঞ্চিত করা। আল্লাহর লা'নত মানে হচ্ছে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করা, আল্লাহ যাকে লা'নত করেন সে দুনিয়াতে হয় হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে হয় জান্নাত বঞ্চিত।

বিধানঃ ৫. ত্বাগূতের সাথে নৈতিক বা আদর্শিক সম্পর্ক রাখাও কুফর। যে মুসলিম কোনো ত্বাগূতের সাথে নৈতিক বা আদর্শিক সম্পর্ক রাখল সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে..

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257)

আল্লাহ মুঅমিনদের ওয়ালী। তিনি তাদেরকে বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার থেকে একমাত্র আলোতে (তথা সকল প্রকার কুফর থেকে একমাত্র সঠিক দ্বীন ইসলামে) আর যারা কুফর করে তাদের ওয়ালী হয় ত্বাগুত (ইসলাম বিদ্বেষী নেতারা) যারা তাদেরকে বের করে আনে একমাত্র আলো থেকে নানা প্রকার অন্ধকারে (ঈমান থেকে কুফরে) তারা (ত্বাগুত ও তার অনুসারীরা) জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৭)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ওয়ালী ও বন্ধু পরিচিতিঃ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্যকে ওয়ালী বানানো কুফর। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য নিম্নে ওয়ালীর সংজ্ঞা এবং এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিধান তুলে ধরা হল।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। একসাথে একই সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষ সাধারণত পরস্পরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের আপন হয়ে যায়। এমন সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব।

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ। বাস্তবে মেনে চলার জন্য ইসলাম যে বিধান দিয়েছে এর নাম ইসলামী শারীয়া'হ। মানব জীবনের সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। বন্ধুত্ব মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়নি ইসলাম। শারীয়া'হ বিধান মতে বন্ধুত্বের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যথা..

ক. সাধারণ বন্ধু, রাফিক্বঃ রাফিক্ব অর্থ কোমল, নমনীয়। চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক সময়ে এ সম্পর্ক হৃদ্যতায় রূপ নেয়। মানুষ তখন একে অন্যের প্রতি কোমল ও নমনীয় হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বন্ধুকে বলা হয় সাধারণ বন্ধু, রাফিক্ব।

খ. বিশ্বস্ত বন্ধু, সাদীক্বঃ সাদীক্ব অর্থ বিশ্বস্ত। ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয় এবং একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। মানুষ এক পর্যায়ে একে অপরকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শামিল করে নেয়। মানুষের এমন বন্ধুকে বলে সাদীক্ব, বিশ্বস্ত বন্ধু।

বিধানঃ রাফিক্ব ও সাদীক্ব এ দুই ধরণের বন্ধুত্বের মূলভিত্তি মানবতা। মানুষ হিসেবে যে কারো সাথে এমন বন্ধুত্ব হতে পারে। এতে শারীয়া'হ কোনো বাঁধা নিষেধ আরোপ করেনি।

গ. অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু, খালীলঃ খালীল অর্থ অতি আপনজন, একান্ত বন্ধু, আদর্শিক বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দিনে দিনে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলে খালীল, একান্ত বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু।

বিধানঃ এমন বন্ধুত্বের মূলভিত্তি আদর্শিক, আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ভালোবাসা। এমন বন্ধুত্ব সবার সাথে করা ভালো নয়। মন্দলোকের সাথে এমন সম্পর্ক করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। তাই রাসূল সাঃ এমন বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে..

حديث أبي هريرة :أن النبي ﷺ قال :الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মানুষ তার খালীলের আদর্শে আদর্শবান হয়। তাই মানুষকে ভাবতে হবেঃ কাকে সে খালীল বানাবে। (আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ।)

ঘ. ওয়ালীঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল। বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর দায়ভার নিতে বা বন্ধুর জন্য কোনো ঝামেলায় জড়াতেও দ্বিধা করে না। অর্থাৎ যে বন্ধুত্বের সাথে অভিভাবকত্বসহ অনেক দায়ভার এসে যায়, এমন বন্ধুকে বলে ওয়ালী।..

- ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে,
- ওয়ালী পরিবার হতে পারে,
- ওয়ালী সম্প্রদায় হতে পারে,
- ওয়ালী জাতি হতে পারে
- ওয়ালী দেশ বা রাষ্ট্র হতে পারে।

ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, শান্তি চুক্তি, সামরিক চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যেমন...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী।
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী তার স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী।

ওয়ালী বানানোর নীতিঃ চুক্তির মাধ্যমেও একে অপরকে ওয়ালী বানানো যায়। ওয়ালী বানানোর জন্য..

- ব্যক্তির সাথে চুক্তি করা যায়,

- পরিবারের সাথে চুক্তি করা যায়,
- সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি করা যায়,
- অনুরূপ ভাবে জাতির সাথে এবং রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করেও ওয়ালী বানানো যায়।

বিধানঃ কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ (যতই আপন হোক না কেন) মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারবে না। ইসলামী বিধান মতে ওয়ালী হবার বা ওয়ালী বানাবার মূল ভিত্তি ঈমান। মুসলিম ব্যক্তি শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই কারো ওয়ালী হতে পারবে বা কাউকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কোনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না। এদের সাথে ওয়ালীর সম্পর্ক রাখা পাপ ও বিভ্রান্তির পথ। প্রকৃত মুঅমিন না হলে আপন বাবা, মা, ভাই, বোনদের সাথেও এমন সম্পর্ক রাখতে বারন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমাদের বাবা-মা ও ভাইবোন (এদের কেও) যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তোমরা তাদেরকে ওয়ালী বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে তাদেরকে ওয়ালী বানাবে বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে সে জালিম (অপরাধী) হিসেবে গণ্য হবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

সুতরাং যে বা যারা ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালো বাসবে বা বেশী পছন্দ করবে তারা আমাদের ওয়ালী হতে পারে না। তাই তো...

- কাফির পিতা মুসলিম সন্তানের ওয়ালী হয় না। মুসলিম সন্তান মারা গেলে কাফির পিতা তার সম্পদের অংশ পায় না।
- কাফির সন্তান মুসলিম পিতা-মাতার ওয়ালী হয় না। মুসলিম পিতা-মাতা মারা গেলে কাফির সন্তান তাদের সম্পদে অংশ পায় না।
- কাফির স্বামী মুসলিম স্ত্রীর ওয়ালী হয় না। তাই কোনো মুসলিম নারীর স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে অথবা কাফিরের স্ত্রী মুসলিম হয়ে গেলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এ স্ত্রী তালাক ছাড়াই অন্য মুসলিমকে বিয়ে করতে পারে।

বিধানঃ ৬. কোনো ত্বাগূতকে ওয়ালী বানানো কুফর। যে মুসলিম কোনো ত্বাগূতকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভবাবক, নীতি নির্ধারক বা আপনজন) হিসেবে মেনে নিল তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেলো এবং সে হয়ে গেলো চির জাহান্নামী মুনাফিক। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139)

মুনাফিকদেরকে সংবাদ দাও যে; তাদের তরে অবধারিত আছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যারা মুঅমিনদের বদলে কাফিরদেরকে ওয়ালী বানায়। এরা কী তাদের কাছে ইজ্জত চায়? আসলে সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (৪ নিসাঃ ১৩৮,১৩৯)

বিধানঃ ৭. ত্বাগূ'তের জন্য যুদ্ধ করা বা ত্বাগূতের পক্ষে সংগ্রাম করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)

যারা ঈমান আনে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কুফর করে তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে। সুতরাং (হে মুঅমিনগণ!) শয়তানের আওলিয়াদের (মিত্রদের) সাথে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল। (৪ নিসাঃ ৭৬)

সারকথাঃ সুতরাং...

- যে মুসলিম ত্বাগূত বর্জন করল না
- যে মুসলিম ত্বাগূতকে সমর্থন করল
- যে মুসলিম নীতিগতভাবে ত্বাগূতকে মেনে নিল
- যে মুসলিম ত্বাগূতের সাথে নৈতিক বা আদর্শিক সম্পর্ক গড়ে তুলল বা বজায় রাখল
- যে মুসলিম কোনো ত্বাগূতকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক বা নীতি নির্ধারক) হিসেবে মেনে নিল
- যে মুসলিম ত্বাগূতের বিচার বা শাসন স্বেচ্ছায় মেনে নিল
- যে মুসলিম কোনো ত্বাগূতের পক্ষে সংগ্রাম করল

তথা যে মুসলিম উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়ল সে কুফর করল। আর যে মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ল তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেল, তার সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে গেল আর সে হয়ে গেল চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। এমনকি মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) (মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের বই 'মুঅমিন ও মুনাফিক')

অনুচ্ছেদঃ ৩. আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ বা ইসলাম গ্রহণ

তাওবাহ এবং ত্বাগূ'ত বর্জনের পর আমাদের পরবর্তী ফরজ দায়িত্ব হল আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের নৈতিক ও আদর্শিক দায়িত্ব। মহান আল্লাহর ইবাদাত করার একমাত্র সঠিক পথ হল আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহন করা আর ইবাদাতের একমাত্র সঠিক পদ্ধতি হল সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত থেকে হানীফ পদ্ধতিতে (একনিষ্ঠভাবে) আল্লাহর দ্বীন মেনে চলা। উল্লেখ্য আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম গ্রহণ।

উল্লেখ্য ইসলাম ছাড়া অন্য সকল নীতি, আদর্শ, দর্শন ও মতবাদ বর্জন করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয় একমাত্র আল্লাহর বিধানকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নেওয়া ও বাস্তবে মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে (একনিষ্ঠভাবে) দ্বীন পালন করা।

ইসলাম ও মুসলিম পরিচিতিঃ ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা আর মুসলিম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পকারী। ইসলামী পরিভাষায় ওই ব্যক্তিকে মুসলিম বলা হয়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর দেওয়া দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা ও সকল বিধিবিধান নীতিগতভাবে মেনে নিল এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নিল। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131)

শুধু নির্বোধ লোকেরাই ইবরাহীমের আদর্শ থেকে বিমুখ হয়ে থাকে। আমরা এ দুনিয়ায় তাকে মনোনীত করেছি আর আখেরাতে সে সৎলোকদের একজন। (কারণ) প্রভু যখন তাকে বলেছেনঃ "ইসলাম গ্রহন কর তথা আত্মসমর্পণ কর" সে তৎক্ষণাৎ বলেছেঃ "আমি রাব্বু-ল-আ'লামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম"। (২ বাক্বারাহঃ ১৩০-১৩১)

জীবনের লক্ষ্যঃ মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধুই তার ইবাদাতের জন্য। আর আল্লাহর ইবাদাত করার একমাত্র অনুমোদিতও গ্রহনযোগ্য পথ হচ্ছে ইসলাম। তাই ইসলাম গ্রহণ করা এবং ইসলাম মত জীবনযাপন করা আমাদের সকলের উপর ফরজ আর এটাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইরশাদ হচ্ছে..

আমি জিন্ন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদাতের জন্য (৫১ যারিয়াতঃ ৫৬)	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ইবাদাত পরিচিতিঃ মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে..

- নিজের উপর মহান আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিতে হয় তথা মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কারো প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া যাবে না।
- পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনতে হয় তথা আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া যাবতীয় তথ্যসমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় এবং এর বিপরীতে কোনো কিছু বিশ্বাস করা যাবে না।
- আল্লাহর দেওয়া ও রাসূলের আনীত যাবতীয় আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কোনো আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান, রীতিনীতি বা মতবাদ মেনে নেওয়া যাবে না।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ব দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা ও বিধিবিধানকে মেনে চলতে হয় এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু করা যাবে না।

ইবাদাতের সঠিক পথঃ আমাদের মহান প্রভু হলেন আল্লাহ্ এবং তিনি নিজেই তাঁর ইবাদাতের সঠিক পথ ও সঠিক পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, ঠিক করে দিয়েছেন ইবাদাতের সঠিক ও সুস্পষ্ট নীতিমালা। আল্লাহর বাতানো পথে, আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আল্লাহর দেওয়া নীতিমালা মেনেই আল্লাহর ইবাদাতের করতে হয়।

মহান আল্লাহর ইবাদাত করার একমাত্র সঠিক পথ হল আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা তথা ইসলাম গ্রহন করা। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র দ্বীন (জীবন আদর্শ) হল ইসলাম..। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৯)	إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে যা করা হয়; শুধু তা-ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় আর এটাই ইসলাম। ইসলাম গ্রহণ করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

وعَن ابن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺأُمِرْتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ويُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذا فَعلوا ذلكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلاَّ بحَقِّ الإِسلامِ وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ مُتفقٌ عليه.

ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল

আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। তারা যদি এসব মেনে চলে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ থাকবে তবে ইসলামের কোনো অধিকার (নষ্ট করলে এজন্য সাজার সম্মুখীন হতে হবে। আর বাহ্যত ইসলাম মেনে চললে) তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহর উপর। (হাশরের মাঠে মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে যথাযথ হিসাব করবেন এবং ফয়সালা করবেন।) (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য ইসলাম গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি আর মূল লক্ষ্য অনন্ত জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নার অর্জন এবং এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু অনেক মুসলিমই জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। কারণ ঈমান ও আমল বিবেচনায় মুসলিমরা আবার ৩ প্রকার হয়ে যায়। মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।

মুঅমিনঃ

- যে মুসলিম সকল প্রকার ত্বাগুতকে বর্জন করল
- যে মুসলিম ইসলামের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল
- যে মুসলিম বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে ইসলামী আইন ও বিধান মেনে নিল
- যে মুসলিম বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে ইসলামী আইন ও বিধান মেনে চলল; তাকে মুঅমিন বলা হয়।
- অন্য কথায় যে মুসলিম ঈমান গ্রহণ করল এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকল সে-ই মুঅমিন
- অন্য কথায় যে মুসলিম সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বিরত থাকতে পারল সে-ই মুঅমিন।

যেব্যক্তি মুঅমিন হতে পারল তার জীবন সফল। মুঅমিন ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হয়ে যায়। মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তাদের অনুমতি দেন।

মুনাফিকঃ যে মুসলিম ইসলামের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল না বা ত্বাগুত্ব বর্জন করল না অথবা ইসলামী শারীয়াহ বা শারীয়ার কোনো বিধান পছন্দ করল না; সে মুনাফিক।
অন্য কথায় যে মুসলিম কোনো প্রকার কুফর/শিরকে জড়িয়ে ঈমানকে নষ্ট করে ফেলল সে মুনাফিক।

যে ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে গেলো সে চির তরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য সর্বনিম্ন জাহান্নাম। মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতে কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযায় শরীক হতে বা তাদের জন্য দোয়া করতে আল্লাহ তায়া'লা নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে..
...তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে তার জন্য সালাত (জানাযা, দোয়া) করবে না আর (দাফন বা জিয়ারতের জন্য) তার কবরেও দাঁড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। (৯ তাওবাহ: ৮৪)

ফাসিকঃ যে মুসলিম সকল প্রকার ত্বাগুতকে বর্জন করল, ইসলামের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল, তবে বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী বিধান মেনে চলল না; সে ফাসিক।
যে ব্যক্তি ফাসিক হয়ে গেলো সে তার সর্বনাশ করে ফেলল। ফাসিক ব্যক্তি পরকালে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্ ক্ষমা না করলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তবে পাপের সাজা হিসেবে জাহান্নামে গেলেও ফাসিক চির জাহান্নামী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে। সকল ফাসিককে আবার জাহান্নামে যেতে হবে না। নেক লোকদের শাফায়া'তে (সুপারিশে) এবং আল্লাহর দয়ায় অনেক ফাসিকই মাফ পেয়ে যাবে।

মুঅমিন হওয়ার পূর্বশর্তঃ মুঅমিন হতে হলে প্রথমেই সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করতে হবে, কারন ত্বাগূত বর্জন হচ্ছে ঈমানের পূর্বশ্রত, ত্বাগূত বর্জন না করলে কারো ঈমান গ্রহনযোগ্য হয় না। অতঃপর মহান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন..

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

..সুতরাং যে ব্যক্তি সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। (বাক্বারাহঃ ২৫৬)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

না.., তোমার প্রভুর কসম! তারা মুঅমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের যাবতীয় বিষয় মীমাংসার জন্য তোমার কাছে আসবে, তোমার ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে চলবে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে। (৪ নিসাঃ ৬৫)
জ্ঞাতব্যঃ এখানে মুঅমিন হবার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এ তিন শর্তের যে কোনো একটি পরিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে কোনো ব্যক্তি মুঅমিন হতে পারবে না। শর্ত ৩টি হচ্ছে..

- জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে রাসূল সাঃর তথা ইসলামী বিধানের শরণাপন্ন হওয়া।
- রাসূলের ফয়সালা তথা ইসলামী বিধান বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া।
- আল্লাহর (বিধান ও রাসূল সাঃর আদর্শের) কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।

আত্মসমর্পণ পরিচিতিঃ নিজের জীবনের সবকিছু আল্লাহর কাছে সপে দেওয়া এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করার নাম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)

বলো! আমার সালাত, আমার সাধনা, আমার জীবন, আমার মরণ (তথা আমার জীবনের সবকিছু একমাত্র) রাব্বু-ল-আ'লামীন আল্লাহর জন্য, যার কোনো শরীক নেই আর আমাকে এমন আদেশ-ই দেয়া হয়েছে। আমি-ই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। (৬ আনয়ামঃ ১৬২-১৬৩)

জ্ঞাতব্যঃ নিজের সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারলে-ই কেবল মুসলিম হিসেবে দাবী করতে পারেন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ বা রাসূল কোনো সিদ্ধান্ত করে ফেললে (এ ব্যাপারে) মুঅমিন পুরুষ বা নারী কারো কোনো এখতিয়ার থাকে না। (বরং সবাইকে এটা মেনে নিতে হয় এবং মেনে চলতে হয়। আল্লাহ বা রাসূলের কোনো সিদ্ধান্ত অমান্য করা অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হয়) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে গেল সে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। (৩৩ আহযাবঃ ৩৬)

ইসলামের মূল বিষয়ই আত্মসমর্পণ আর আত্মসমর্পণের বিষয়টিকে ভালো ভাবে বুঝার জন্য এখানে একটি কবিতা যুক্ত করা হল..

আত্মসমর্পণ

আল্লাহ আমার একক ইলাহ
আল্লাহ আমার রব,
মুসলিম আমি, সপে দিয়েছি
আল্লাহর কাছে সব।

আমার চিন্তা আমার চেতনা
আমার মুখের কথা,
ইবাদাত সব আরাধনা আর
সুখ আছে যত ব্যথা,

আমার জীবন আমার মরণ
যত পথে যত চলা,
সংগ্রাম আমার সাধনা আমার
যত কথা যত বলা,

সব-ই আমার প্রভুর তরে
প্রভু যাতে খুশি রয়,
প্রভুর পথের সিপাহি আমি
কাউকে করিনা ভয়।

প্রভুর কথা-ই আমার কথা
প্রভুর মতে-ই মত,
আমি দাস তিনি মালিক আমার
তাঁর পথ-ই আমার পথ।

তাঁর ইশারাতে জীবনের সব
দিতে পারি কুরবান,
তাঁর তরে মোর জীবন মরণ
তিনি যে মেহেরবান।।

উল্লেখ্য ইসলামের মৌলিক বিষয় ৫টি। যথা..
১. এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
২. সালাত কায়েম করা
৩. যাকাত আদায় করা
৪. রামাদ্বান মাসে সিয়াম সাধন করা
৫. বাইতুল্লাহ গিয়ে হাজ্ব পালন করা

বিঃ দ্রঃ = ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয় নিয়ে আমাদের স্বতন্ত্র একটি বই রয়েছে। নাম "ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ঃ পরিচিতি ও বিধান"। এসব বিষয়ে স্ববিস্তারে জানার জন্য বইটি অধ্যয়নের আবেদন রইল।

ইবাদাতের সঠিক পদ্ধতিঃ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে; ভুল পদ্ধতিতে ইবাদাত করলে এসব আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হয় না আর সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যথা..

- ইবাদাতকারীকে নৈতিক, আদর্শিক ও বিশ্বাসগতভাবে সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং নিজের কর্ম ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে, ইসলামের পরিভাষায় এর নাম ইখলাস্ব।
- ইবাদাতকারীকে নীতিগত, বিশ্বাসগত ও কর্মগতভাবে একনিষ্ঠ হতে হবে তথা অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে শুধুই ইসলামকে মেনে নিতে ও মেনে চলতে হবে, আর ইসলামের পরিভাষায় এর নাম হানীফ পদ্ধতি।

হানীফ পদ্ধতিতে সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95)

বলো! মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন। তোমরা সবাই ইবরাহীমের আদর্শ অনুকরণ করবে "হানীফ" পদ্ধতিতে। আর (মনে রাখবে) সে কখনো মুশরিক ছিল না। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৯৫)

জ্ঞাতব্যঃ সকল মত, পথ, নীতি, আদর্শ দর্শন ও মতবাদকে বিসর্জন দিয়ে এককভাবে আল্লাহর দ্বীন ও বিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলার নাম **"হানীফ"** পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা।

আর ইখলাস্ব বা ভেজালমুক্ত থাকার ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযত কিতাব। সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত কর শুধুই তার জন্য ভেজাল মুক্ত দ্বীন মেনে। (৩৯ যুমারঃ ২)

বল! আমি (মুহাম্মাদ) ইবাদাত করি শুধুই আল্লাহর। আমার দ্বীন ভেজাল মুক্ত (৩৯ যুমারঃ ১৪)	قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে একাগ্রচিত্তে তথা হানীফ পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদাত করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর এটাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। (৯৮ বায়্যিনাতঃ ৫)

আল্লাহর বাতানো মূলনীতি মেনে যে ইবাদাত করা হবে শুধু এটাই আল্লাহর কাছে গৃহিত ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে আর আল্লাহর বাতানো মূলনীতির বাইরে গিয়ে যা করা হবে এসবই হবে ভেজাল অথবা ভেজালযুক্ত। আর ভেজালযুক্ত কোনোকিছু আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য হয় না। বরং শুধু ভেজালমুক্ত ইবাদাত-ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

মনে রেখো! শুধু ভেজালমুক্ত দ্বীনই আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য.. (৩৯ যুমারঃ ৩)	أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

অনুচ্ছেদঃ ৪. তাযকিয়্যাহ

ইসলাম গ্রহণের পর আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে তাযকিয়্যাহ। মুঅমিন হতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে যেসব কাজ করতে হয় তাযকিয়্যাহ এসবের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি। তাযকিয়্যাহ মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট।

তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। তাই এ সুযোগের অপব্যবহার করে এক শ্রেণীর ভন্ডপীর জীবনভর আমাদেরকে প্রতারিত করে চলছেন, উনারা তাযকিয়্যাহ শব্দটিকে অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। তাই তাদের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে হলে এবং ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হলে তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যক। সুতরাং আসুন! বিষয়টি সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

তাযকিয়্যাহ পরিচিতিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধকরণ, শুদ্ধিকরণ, পরিচ্ছন্নকরণ, সত্যায়ন করা, পাপমুক্তকরণ, ইত্যাদি। মহান আল-কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরকমুক্ত করা" আর তাফসীর ক্বুরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে..

- অন্তর দিয়ে ঈমান আনা
- নিজেকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত করা এবং মুক্ত রাখা
- সম্পদের যাকাত আদায় করা। ইত্যাদি

তাযকিয়্যাহর সম্পর্কে আল-কুরআনের আয়াতসমূহ ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় তাযকিয়্যাহর ৩টি ধাপ রয়েছে। যথা..

১ম ধাপঃ ১ম ধাপের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে নিজেকে যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে বিশুদ্ধ করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা। এমন ধরণের তাযকিয়্যাহ জীবনে ধারন করা এবং এজন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। কারনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে না সে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে আর তখন সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। আল-কুরআনে সূরাহ বাক্বারাহর ১২৯ এবং ১৫১তম আয়াতে, সূরাহ আ-ল ই'মরানের ১৬৪তম আয়াতে, জুমুয়া'হর ২য় আয়াতে এবং নাযিয়াতের ১৮তম আয়াতে এ ধরণের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে। যেমন..

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)

হে রাব্ব! তাদেরই (মক্কায় বসবাসকারী আরবদেরই) একজনকে তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিও, যে তাদের কাছে তোমার বিধান পাঠ করবে, শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (সুন্নাহ) আর তাদেরকে তাযকিয়্যাহ (যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত) করবে। নিশ্চয় তুমি মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২ বাকারাহঃ ১২৯)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151)

যেমন তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি তোমাদের-ই একজনকে। সে তোমাদের কাছে আমার আয়াত (কিতাব, বিধান) পাঠ করবে, তোমাদেরকে তাযকিয়্যাহ (যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত) করবে, শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেবে যা তোমরা জানতে না। (২ বাকারাহঃ ১৫১)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164)

আল্লাহ মুঅমিনদের প্রতি দয়া করেছেন, যখন তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন তাদেরই একজনকে, যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত (কিতাব ও বিধান) পাঠ করবে, তাদেরকে তাযকিয়্যাহ (যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত) করবে, শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও ইতোপুর্বে তারা চরম বিভ্রান্ততে নিমজ্জিত ছিল। (আ-ল ই'মরানঃ ১৬৪)

২য় ধাপঃ ২য় ধাপের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে যাবতীয় কাবীরাহ গোনাহ (মহাপাপ) থেকে বিশুদ্ধ হওয়া ও পরিচ্ছন্ন থাকা। এ ধরণের তাযকিয়্যাহর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ফরজ। কাবীরাহ থেকে বেঁচে থাকতে না পারলে মানুষ ফাসিক হয়ে যায় এবং তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের কোনোকিছু গোপন করে অথবা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে বদলে ফেলে, তারা আগুন দিয়েই উদরপূর্তি করছে। পরকালে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ থেকে মুক্ত) করবেন না। আর তাদের তরে কঠিন আযাব। (২ বাকারাহঃ ১৭৪)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)

আর যারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আখেরাতে তাদের জন্য কিছুই নেই। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ থেকে মুক্ত) করবেন না এবং তাদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭৭)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

45/1852-وَعنْ أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يوْمَ الْقِيَامةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلا ينْظُرُ إِلَيْهِمْ ولَهُمْ عذَابٌ أليمٌ شَيْخٌ زَانٍ ومَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِل مُسْتَكْبِرٌ. رواهُ مسلم

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ পরকালে তিন ধরণের মানুষের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদেরকে তাযকিয়্যাহ (পাপ থেকে মুক্ত) করবেন না এবং তাদের তরে আছে কঠিন আযাব। (আর এ ৩ ব্যক্তি হচ্ছে..) বৃদ্ধ যিনাকারী, মিথ্যুক শাসক আর দাম্ভিক ভিক্ষুক। (মুসলিমঃ ৪৫/১৮৫২)

৩য় ধাপঃ ৩য় ধাপের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে সকল প্রকার পাপ ও বদ অভ্যাস থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা তথা নিজেকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করে ফেলা, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা কেবল আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। সূরাহ নাজম এর ৩২ তম আয়াতে এ ধরণের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (32)

যারা (কুফর শিরক ও নেফাকসহ) বড় বড় পাপ আর (যিনা, সমকামিতাসহ সকল) অশ্লীলতা পরিহার করে চলবে (তাদের) ছোট পাপসমূহ (আল্লাহ মাফ করে দেবেন।) নিশ্চয় তোমার প্রভূর ক্ষমা অপরিসীম। তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে অবগত; যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যখন তোমরা ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে ছিলে। সুতরাং (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি!) তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে /একে অপরকে তাযকিয়্যাহ করো না /নিজেদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে এমন মনে কর না। আসলে শুধু তিনিই জানেন; কে মুত্তাক্বী হতে পেরেছে। (৫৩ নাজমঃ ৩২) (যে ব্যক্তি কুফর, শিরক ও পাপচার থেকে বেঁচে থাকল সেই মুত্তাক্বী)

তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ ১ম ধাপের তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সা.র সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে নিজের জীবন এবং আত্মাকে যাবতীয় কুফর শিরক থেকে মুক্ত করতে হবে এবং মুক্ত রাখতে হবে। এটাই ১ম শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি। মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু তাযকিয়্যাহ আমাদেরকে করতেই হবে।

২য় ধাপের তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সা.র সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে নিজের জীবন এবং আত্মাকে যাবতীয় পাপাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, দম্ভ-অহমিকাসহ সকল প্রকার অবৈধ কামনাবাসনা থেকে পরিচ্ছন্ন করার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এটাই ২য় শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি। মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু প্রচেষ্টা আমাদেরকে করতেই হবে। তবে এমন বিষয়ে চূড়ান্ত তাযকিয়্যাহ হবে পরকালে। বিচার দিনে মহান আল্লাহ্ মানুষের পাপসমূহ মোচন করে মানুষকে এমন তাযকিয়্যাহ দান করবেন।

৩য় ধাপের তাযকিয়্যাহ মানে যাবতীয় পাপ কাজ এবং দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল আল্লাহই পারেন মানুষকে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত করতে এবং মুক্ত রাখতে। তাই এ জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

একটি ভূলের অবসানঃ আমাদের সমাজের কিছু ভন্ডপীর তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে পীরের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসেবে কাজ করা।

তাযকিয়্যাহ সম্পর্কিত কয়েকটি বিধানঃ

বিধানঃ ১. আল্লাহ্ রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষকে তাযকিয়্যাহ করার জন্য অর্থাৎ যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত করার জন্য এবং পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে...

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (2)

তিনিই উম্মীদের (আরবদের) মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব পাঠ করবে, (যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে) তাদেরকে তাযকিয়্যাহ করবে এবং শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও ইতোপূর্বে তারা চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (৬২ জুমুয়া'হঃ ২)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (17) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ (18)

(হে নবী!) তোমার কাছে কী এসেছেঃ মূসার খবর? তাঁর রাব্ব যখন তাকে পবিত্র তোয়া উপত্যকায় ডেকে নিয়ে বলেছিলেনঃ ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছে, তাকে বলঃ তুমি কি নিজেকে তাযকিয়্যাহ (যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে বিশুদ্ধ) করতে চাও? (৭৯ নাযিয়াতঃ ১৫-১৮)

বিধানঃ ২. তাযকিয়্যাহ সফলতার মাপকাঠি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন করতে এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে পারল সে তার জীবনের লক্ষ্য অর্জনে অবশ্যই সফল হয়ে গেলো। এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন..

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (15)

ওই ব্যক্তি সফল হয়ে গেছে যেব্যক্তি তাযকিয়্যাহ হতে পেরেছে (তথা যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত হতে পেরেছে), প্রভুর নাম স্মরণ করেছে আর সালাত (নামায, দ্বীন) পালন করেছে। (৮৭ আ'লাঃ ১৪-১৫)

বিধানঃ ৩. পাপ মোচনকেও তাযকিয়্যাহ বলা হয়। আর পাপ মোচন শুধুই আল্লাহর কাজ। তাই পাপ মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)

আর যারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর সাথেকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করল আখেরাতে তাদের পাওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ মুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭৭)

হাদীছে বর্নিত হয়েছেঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ পরকালে তিন ধরণের মানুষের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদেরকে তাযকিয়্যাহ (পাপ থেকে মুক্ত) করবেন না এবং তাদের তরে আছে কঠিন আযাব। (আর এ ৩ ব্যক্তি হচ্ছে..) বৃদ্ধ যিনাকারী, মিথ্যুক শাসক আর দাম্ভিক ভিক্ষুক। (মুসলিমঃ ৪৫/১৮৫২)

বিধানঃ ৪. তাযকিয়্যাহ যেহেতু নৈতিক, আদর্শিক ও আত্মীক ব্যাপার, তাযকিয়্যাহ যেহেতু নীতি, আদর্শ ও আত্মার সাথে সম্পর্কিত, তাই পরিপূর্ণভাবে তাযকিয়্যাহ করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ্ তায়া'লা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ পরিপূর্ণ তাযকিয়্যাহ করতে পারে না /পারবেও না। ইরশাদ হচ্ছে...

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا (50)

তাদেরকে দেখনি? যারা নিজে নিজেকে /একে অপরকে তাযকিয়্যাহ করে /তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে বলে মনে করে। অথচ আসল ব্যাপার হলো (কেউ কাউকে তাযকিয়্যাহ করতে পারে না আল্লাহ ছাড়া। পরিপূর্ন তাযকিয়্যাহ করার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আর) বরং কেবল আল্লাহই তাযকিয়্যাহ করেন যাকে খুশী। (তাযকিয়্যাহ অর্থ কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। যে ব্যক্তি নিজেকে কুফর শিরক থেকে বিরত রাখবে আল্লাহ তাকেই তাযকিয়্যাহ করবেন) কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। লক্ষ্য করঃ (একে অপরকে তাযকিয়্যাহ করতে পেরেছে বা তাযকিয়্যাহ হয়েগেছে মনে করে) তারা কীভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করছে। আর সুস্পষ্ট পাপের জন্য এটা-ই যথেষ্ট। (৪ নিসাঃ ৪৯-৫০)

জ্ঞাতব্য ও পটভূমিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ পবিত্র করণ, বিশুদ্ধ করণ, আত্মশুদ্ধি করণ। যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপ কাজ থেকে নিজের জীবন এবং আত্মাকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখার নাম তাযকিয়্যাহ। যে ব্যক্তি কুফর শিরক ও পাপ কাজ ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাকেই বিশুদ্ধ করেন।

অথচ কিছু মানুষ মনে করে মনগড়া তরিকায় সাধনা করলেই তাযকিয়্যাহ হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করে পীর সাহেবই পারেন মুরিদকে তাযকিয়্যাহ করতে। অনেক ভন্ডপীর তার মুরিদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে বলে সনদ ও দিয়ে দেয়। যারা এমন করে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারে রত। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে আয়াত দুটি নাযিল হয়েছে।

বিধানঃ ৫. একে অপরের তাযকিয়্যাহ করা অথবা নিজের বা অন্য কারো তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে মনে করা নিষিদ্ধ কাজ। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে...

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (32)

তারা (যদি কুফর, শিরক, নেফাকসহ) বড় বড় পাপ আর অশ্লীলতা পরিহার করে চলে তবে তাদের ছোট ছোট পাপসমূহ (আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন।) নিশ্চয় তোমার প্রভূর ক্ষমা অপরিসীম। তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে অবগত; যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে অবস্থান করছিলে। তোমরা নিজে নিজেকে /একে অন্যকে তাযকিয়্যাহ করো না (বা তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে মনে করো না।) তিনিই জানেন; তোমাদের কে মুত্তাক্বী হতে পেরেছে। (৫৩ নাজমঃ ৩২) (যে ব্যক্তি কুফর, শিরক ও পাপচার থেকে বেঁচে থাকল সেই মুত্তাক্বী)

অনুচ্ছেদঃ ৫. ঈমান

আমাদের অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে ঈমান আনা। আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে, ঈমানকে অন্তরে লালন করতে হবে, মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8)

(ওহে মানব ও দানব জাতি!) তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তিনি এ যমীনে তোমাদেরকে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন এসব থেকে (আল্লাহর পথে) খরচ কর। (মনে রেখো!) তোমাদের যারা ঈমান আনবে এবং খরচ করবে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

তোমাদের কী হয়েছে, কেন তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনছ না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যেন তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আন। আর (রূহ জগতে) প্রভুও তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন (তোমরা তখন অঙ্গীকার করেছ যে তোমরা ঈমান আনবে এবং তাঁর বিধান মেনে চলবে) তোমরা যদি এসব ব্যাপারে বিশ্বাসী হয়ে থাকো (তবে অবশ্যই ঈমান আনো এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলো।) (৫৭ হাদীদঃ ৭-৮)

ঈমান পরিচিতিঃ ঈমান এর মূল শব্দ "আমান" অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি আর ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে মানব ও দানব তাদের চিরস্থায়ী জীবনে নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করে নেয় বিধায় একে ঈমান বলা হয়। ঈমান আনতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে ৫টি কাজ করতে হয়। যথা..

- প্রথমে সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করতে হয়, এটা হল ঈমানের পূর্বশর্ত, ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান শুদ্ধ হয় না।
- আল্লাহ ও রাসূলগণের বাতানো সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় (আর এটা-ই ঈমানের মূল বিষয়। বিশ্বাসে নড়বড়ে হলে ঈমান হয় না বরং এটাকে কুফর বলা হয়।)
- আল্লাহর দেওয়া এবং রাসূলের আনীত সকল বিধিবিধানকে নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু মেনে নেওয়া যাবে না। (মানলে কুফর হবে এবং তখন ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে)
- ঈমানের ঘোষণা দিতে হয়। (এটা ঈমানের সামাজিক দিক। ঘোষণা না দিয়ে ঈমানকে গোপন রাখলেও ঈমান হয়ে যায়। দেখুন গাফিরঃ ২৮)
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হয়। (নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার পর বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে না পারলে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি এমন করে সে আর মুঅমিন তথা ঈমানদার থাকে না বরং ফাসিক হয়ে যায় এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়।)

উল্লেখ্য যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে মুঅমিন বলা হয়। মুঅমিন হতে হলে প্রথমে মুসলিম হতে হয়। আর মুসলিম হতে হলে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়।

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা আর মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী। নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় বিধিবিধানকে নিতিগতভাবে মেনে নেওয়া এবং বাস্তবে মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করার নাম ইসলাম গ্রহণ। যেব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে সে মুসলিম আর..

- যে মুসলিম সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করেছে,
- যে মুসলিম ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত হয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেছে এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু বিশ্বাস করেনি,
- আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় বিধিবিধানকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু মেনে নেয়নি
- যে মুসলিম তার বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলে, তাকে মুঅমিন বলা হয়।

সুতরাং মুঅমিন হতে হলে আমাদেরকে..

- প্রথমে যাবতীয় কুফর শিরক পরিত্যাগ করতে হবে (এটাকে বলা হয় তাওবাহ)
- তারপর সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করতে হবে (এর নাম ত্বাগূ'ত বর্জন)
- তারপর আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে এবং নৈতিক ও আদর্শিকভাবে আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় বিধিবিধান মেনে নিতে হবে এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু বিশ্বাস করা যাবে না এবং মানাও যাবে না। (এর নাম ঈমান)
- তারপর মনের গভীরে ঈমানকে স্থাপন করতে হবে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হবে। (এটা হল ইস্তিক্বামত /তথা ঈমানের উপর অবিচল থাকা)
- শুধু মুখে মুখে ঈমান আনলে মুঅমিন হওয়া যায় না। (মুখে ঈমান আর অন্তরে নেই এর নাম মুনাফিকী বা নিফাক্ব)
- সর্বোপরি বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া নীতিমালা ও বিধিবিধান মেনে চলতে হবে, (আর এর নাম আ'মাল)

ঈমান গ্রহণ করা ও ঈমানের উপর অবিচল থাকাঃ বিশ্বাসগত, নীতিগত ও আদর্শগতভাবে উল্লেখিত সকলকিছু মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে এর প্রতিফলন ঘটানোর নাম ঈমান গ্রহন করা আর মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর অটল ও অবিচল থাকার নাম ইস্তিকামত বা ঈমানের উপর অবিচল থাকা। তাই আমাদেরকে শুধু ঈমান আনলেই হবে না বরং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হবে এবং ঈমানকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্য সনাতন বা অধুনিক যে কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তখন সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি এমন করে সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

..আর যে ব্যক্তি ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করল/করবে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে গেল/যাবে। আর আখেরাতে সে (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। (৫ মা-ইদাহঃ ৫)

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)

(হে নবী!) তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে; "শিরক করলে তোমার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে" এবং তুমি (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর ও শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে কোনোভাবে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর কোনো মুসলিম এমন করলে সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়তে এবং তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুন তাওবাহঃ ৮৪)

ঈমানের স্থান অন্তরেঃ মুঅমিন হতে হলে অন্তর দিয়ে ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানকে অন্তরে লালন করতে হবে, শুধু মুখে মুখে ঈমান আনলে মুঅমিন হওয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে...

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)

কিছু মানুষ এমন আছে যারা (মুখে) বলেঃ আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি, (ঈমান আনলে মানুষ মুঅমিন হয়। আর মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। কিন্তু ওইসব লোক মুখে ঈমানের কথা বললেও) আসলে এরা মুঅমিন নয়। (২ বাক্বারাহঃ ৮)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14)

বেদুইনরা বলেঃ "আমরা ঈমান এনেছি"। বলে দাওঃ তোমরা ঈমান আননি। বরং বলো "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি"। কারণঃ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর (তথা সঠিকভাবে ঈমান আনো।) তবে আল্লাহ তোমাদের আ'মাল বরবাদ করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ গাফূর, রাহীম।

(৪৯ হু'জরাতঃ ১৪)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, ইবাদাত করে, অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলে কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান থাকে না। আল্লাহর তালিকায় তারা কাফিরই থেকে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, রাসূলের উপর নাযিলকৃত কিতাব এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান আনো। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ, আল্লাহর ফিরিস্তা, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর রাসূল ও আখেরাতের উপর ঈমান আনল না সে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। (৪ নিসাঃ ১৩৬)

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41)

হে রাসূল! যারা মুখে বলে "আমরা ঈমান এনেছি" আর অন্তর দিয়ে ঈমান আনেনি (অর্থাৎ যারা মুনাফিক) আর যারা ইয়াহুদ তাদের কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া যেন তোমাকে ভাবনায় না ফেলে। (তাদের স্বভাব হল) তারা (বিভ্রান্ত লোকদের) মিথ্যাচার শুনছে এবং যারা এখনো তোমার কাছে আসেনি (ভবিষ্যতে আসবে) তাদের কথাও শুনবে। তারা আল্লাহর বাণীকে তার সঠিক অবস্থান থেকে তাহরীফ করে (বদলে ফেলে। আর তোমার কাছে মামলা পাঠিয়ে) বলেঃ এমন (ফয়সালা) দিলে মেনে নেবে আর এমন দিলে মানবে না (এমনটি করেছিল একদল ইয়াহুদ উলামা। তারা রাসূল সাঃর কাছে যিনার মামলা

পাঠিয়ে বলেছিলঃ "রাজম" এর সাজা দিলে মানবে না। আর অন্য সাজা দিলে মেনে নেবে। আসলে অধিক পাপের কারণে আল্লাহ তাদের বিভ্রান্ত করে রেখেছেন। আর) আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাইলে তুমি (নবী) কিছুই করতে পারবে না। (যারা এমন করে) আল্লাহ তাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন করবেন না। তাদের তরে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। (৫ মা-ইদাহঃ ৪১)

লক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ এখানে মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের একত্রিত করা হয়েছে। কারণ তাদের স্বভাব প্রায় একই ধরণের হয়।

- আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহই জ্ঞানের মূলউৎস। প্রয়োজনে ইজতিহাদ করতে হলে কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি মেনেই করতে হবে
- দ্বীনি ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহর বিপরীতে যা বলা হয় বা করা হয় সব মিথ্যাচার।
- বিভ্রান্তদের মিথ্যাচার মেনে নেওয়া মুনাফিকদের স্বভাব। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর এখন এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের মুনাফিক সমাজ।
- যারা "শারীয়ার বিধান নিজের বা দলের পছন্দমত হলে মানে, নতুবা মানে না" তারা বিভ্রান্ত। তখনকার দিনে এমন করে বিভ্রান্ত হয়ে ছিল ইয়াহুদ। আর আজকাল এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের অনেক মানুষ। এদের মাঝে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে, স্যাকুলাররা, বিদয়া'তীরা এবং দলবাজরা।
- আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সাঃর হাদীছের কোনো বাণীকে তার আসল অর্থ বা মর্ম থেকে বিচ্যুত করা বিভ্রান্তির পথ। তখনকার দিনে এমন করত ইয়াহুদ উলামা সমাজ আর এখনকার দিনে এমন করছে আমাদের মাঝে সুবিধাবাদী দলবাজরা।

ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহঃ উল্লেখ্য ঈমানের মৌলিক বিষয় ৬টি। যথা..

১. আল্লাহর উপর ঈমান
২. ফিরিস্তাগণের উপর ঈমান
৩. আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর ঈমান
৪. আল্লাহর পাঠানো রাসূলগণের উপর ঈমান
৫. ভালোমন্দ তাক্বদীরের উপর ঈমান
৬. কিয়ামত, পুনরুত্থান ও আখেরাতের উপর ঈমান।

সূত্রঃ হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত এক সুদীর্ঘ হাদীছে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে রাসূল সা. ঈমানের এ ৬টি মৌলিক বিষয় উল্লেখ করেছেন।

বিঃ দ্রঃ = ঈমানের ৬টি মৌলিক বিষয় এবং এসবের উপর ঈমান আনার পদ্ধতি নিয়ে যথাযথ দলীলসহ আলাদা একটি বই আমরা রচনা করেছি এবং "ইসলাম শিক্ষা কোর্স" নামে আমাদের ঈমান আক্বীদাহ সিলেবাসের ৩য় বই হিসেবে বইটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। বইটির নাম "যেভাবে ঈমান আনতে হয়"। নিজের ঈমান আক্বীদাহকে সঠিক ও সুদৃঢ় করার জন্য বইটি অধ্যয়নের আহ্বান রইল।
আমাদের এখনকার কোর্সটি যেহেতু শারীয়া'হ তথা বিধানগত কোর্স। তাই ঈমান ও আক্বীদাহগত বিষয়গুলো এখানে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান ও আক্বীদাহ বিষয়ে স্ববিস্তারে জানতে হলে আমাদের "ইসলাম শিক্ষা কোর্স" অধ্যয়ন করতে হবে। তবে আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ঈমানের ৬টি মোউলিক বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল..

১. আল্লাহর উপর ঈমানঃ আল্লাহর উপর ঈমানের মূল কথা হচ্ছেঃ মহান আল্লাহর জাতিসত্তা ও সকল বৈশিষ্টে আল্লাহকে একক সত্বা হিসেবে মেনে নেওয়া তথা বিশ্বাসগত, আদর্শগত ও কর্মগতভাবে আল্লাহর তাওহীদকে (একত্ববাদে) মেনে নেওয়া। আর এসব করার একমাত্র সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে সাহাবাদের পদ্ধতি। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারাহর ১৩৭ তম আয়াতে।
আল্লাহর জাতিসত্তা বা কোনো বৈশিষ্টে অন্য কাউকে বা অন্যকিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানালে শিরক হয়।
শিরক সবচেয়ে জঘন্যতম মহাপাপ। শিরক অমার্জনীয় অপরাধ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ যুমার এর ৬৫ তম আয়াতে। আর সুরাহ নিসার ৪৮ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি শিরক করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না।
তবুও শিরক থেমে নেই। আমাদের সমাজে নানা ভাবে শিরক করা হয়। আর শয়তান জানে; শিরক করলে আর ক্ষমার সম্ভাবনা থাকে না। তাই সে ছলে বলে কৌশলে মানুষকে দিয়ে শিরক করাতে চায় আর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেক মুসলিম মানুষও নানাভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়ে। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ ইউসুফের ১০৬তম আয়াতে। যেমন..

- আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে, পরিবার আছে বা সাহায্যকারী আছে বলে বিশ্বাস করা। এসব হল আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক
- আল্লাহ ছাড়া অন্যকাউকে সার্বভৌমত্বের মালিক, ক্ষমতার উৎস বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। এসব হল আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যকাউকে বা অন্যকিছুকে সম্মান জানাতে গিয়ে এমন কিছু করা। এটা হল আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে নীতিনির্ধারক বা কর্তৃত্বশীল মনে করা। এটা হল আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া। এটা হল আল্লাহর বুরুবিয়্যাতে শিরক।

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বা অন্যকিছুকে অমর, অব্যয়, অক্ষয়, চিরঞ্জীব, চিরন্তন, ইত্যাদি বিশেষনে বিশেষিত করা। এসব হচ্ছে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে শিরক। ইত্যাদি, ইত্যাদি..।

উল্লেখিত কাজ সমূহ হচ্ছে বড় শিরক। এমন শিরকে জড়ালে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য হারাম হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।
আর আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে কসম করা, অন্যকে খুশী করার জন্য বা অন্যের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ইবাদাত করা। ইত্যাদি হল ছোট শিরক।

২. ফিরিস্তাগণের উপর ঈমানের মূল কথা হচ্ছেঃ ফিরিস্তা নূরের তৈরি, ফিরিস্তা চিরতরে আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য জাতি। সব ফিরিস্তাই ভালো, সৎ ও উত্তম। কোনো ফিরিস্তাই মন্দ নয় এবং তারা কেউ কখনো মন্দকাজ করেনি।

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমানের মূল কথা হচ্ছেঃ

- আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত সকল তথ্যের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু বিশ্বাস না করা, আল্লাহর কিতাবের তথ্যের বিপরীতে গিয়ে কোনোকিছু বিশ্বাস করলে কুফর হবে।
- আল্লাহর কিতাবে বর্নিত সকল নীতি আদর্শ ও বিধিবিধানকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু না মানা। আল্লাহর কিতাবে বর্নিত নীতি, আদর্শ, দর্শন বা বিধানের বিপরীতে গিয়ে কোনকিছু মেনে নিলে কুফর হবে। আর কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে যে কথা বলা হয়েছে সুরাহ মাইদাহর ৫ম আয়াতে। আর যে ব্যক্তি এমন করবে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।
- বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর কিতাবে বর্নিত বিধিবিধান মেনে চলা এবং এর বিপরীতে কোনোকিছু না করা, আল্লাহর কিতাবে বর্নিত বিধানের বিপরীতে কিছু করলে পাপ হয় মহাপাপ।

৪. রাসূলগণের উপর ঈমানের মূল কথা হচ্ছেঃ বাস্তব জিবনে রাসূলের আদর্শকে অনুকরণ করা, সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের সকল বিষয়ে রাসূলের অনুগত থাকা এবং রাসূলের আদর্শ বহির্ভূত সকল নীতি, আদর্শ, দর্শন ও তরীকাকে বিসর্জন দেওয়া। নতুবা কুফরে জড়িয়ে ঈমান হারা হতে হবে।

৫. তাক্বদীরের উপর ঈমানঃ তাক্বদীর আরবী শব্দ। তাক্বদীর অর্থ নির্ধারণ করা। কারো জন্য কনোকিছু নির্ধারণ করে দেওয়াকে তাক্বদীর বলা হয়। মহান আল্লাহ সৃষ্টির সুচনাতেই সৃষ্টিকুলের জন্য সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। সৃষ্টিকুলের জন্য মহান আল্লাহর নির্ধারণ বিষয়সমূহকেই তাক্বদীর বলা হয়।
আমাদের আরো একটি ফরজ দায়িত্বসমূহের মাঝে অন্যতম একটি হচ্ছে তাক্বদীদের উপর ঈমান আনা এবং তাক্বদীর মেনে নেওয়া। এটা হচ্ছে ঈমানের ৬টি মূলনীতির ৫ম মূলনীতি। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ	আমরা সবকিছুকেই "ক্বাদার" (তাক্বদীর) দিয়ে সৃজন করেছি। (ক্বামারঃ ৪৯)
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً	আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের তাক্বদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (ফুরক্বানঃ ২)

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

..আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিপূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ অবশ্যই সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারিত করে রেখেছেন। (৬৫ ত্বালাক্বঃ ৩)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের উপর ঈমান (অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস) রাখা ফরজ এবং ঈমানের ৬টি মূলনীতির মাঝে ৫ম নম্বরে হচ্ছে তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23)

পৃথিবীতে যত বিপর্যয় ঘটে এবং তোমাদের জীবনে যত মুসীবত আসে; এসব সংগঠিত হবার আগেই আমরা কিতাবে (লাউহে মাহফূজে) লিখে রেখেছি (আর এটা-ই তাক্বদীর।) এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ কাজ। (তাক্বদীরের রহস্য ও উপকারিতা

হলো) যেন কিছু হারিয়ে গেলে তোমরা হতাশ হয়ে না পড়ো আর কিছু পেয়ে গেলে অতি উল্লাসিত না হও। (কারণ অতি উচ্ছাস ও উল্লাস অহমিকার জন্ম দেয়। আর) আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৫৭ হাদীদঃ ২২-২৩)

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا	..আল্লাহর সকল বিষয় আগ থেকেই তাক্বদীর হিসেবে নির্ধারণ করা থাকে। (৩৩ আহযাবঃ ৩৮)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61)

(হে আমার বান্দা!) তুমি যে অবস্থায়-ই থাক, কুরআনের যেখান থেকেই তিলাওয়াত কর আর তোমরা যে যখন যে কোনো কাজ কর, প্রতিটি পদক্ষেপে-ই আমরা (আল্লাহ ও ফিরিস্তাগণ) তোমাদের সঙ্গে থাকি /সাক্ষী থাকি। আসমান বা যমীনে অণু পরিমান অথবা এরচেয়ে বড় বা ছোট কোনোকিছু-ই তোমার প্রভু থেকে গোপন থাকে না বরং সবকিছু সুস্পষ্ট ভাবে কিতাবে (লাউহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (আর এর-ই নাম তাক্বদীর। সুতরাং নেককাজ করে ঘোষণা দিতে হবে না আর পাপ করে কেউ গোপন করতে পারবে না) (১০ ইউনুসঃ ৬১)

প্রাসঙ্গিক কথাঃ তাক্বদীর সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টিকে সহজভাবে বুঝার জন্য এমন কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হল..

قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة

আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই আল্লাহ (সু. তা.) সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারণ করে রেখেছেন। (ইবনু হিব্বান। হাদীছটি সাহীহ)

অন্য হাদীছে এসেছে..

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه

কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ মুঅমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে ভালোমন্দ তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে, যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করবে তার কাছে যাকিছু (কল্যাণ বা অকল্যাণ) এসেছে তার কোনোটিই না আসার ছিল না আর যা আসেনি তা আসার ছিল না। (তিরমিযী, জাবির রা. থেকে। শাইখ আলবানীর তাহক্বীক মতেও হাদীছটি সাহীহ।)

سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر	অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মাঝে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাক্বদীর অস্বীকার করবে। (মুসতাদরাক হাকিম। আলবানীর তাহক্বীক মতেও সাহীহ।)

তাক্বদীর সম্পর্কে আক্বীদাহ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ইমাম ত্বাহাবী রাহি. তার কিতাবে লিখেছেন..

قال الإمام الطحاوي رحمه الله :وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه:لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ[الأنبياء 23] (انتهى .من شرح الطحاوية [1/249].

"তাক্বদীর আসলে সৃষ্টি জগতের মাঝে মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য" যে সম্পর্কে নৈকট্য অর্জনকারী কোনো ফিরিস্তা বা প্রেরিত কোনো রাসূলকেও অবগত করাননি। তাই এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করা অথবা বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা বিচ্যুতির কারণ, ধ্বংসের সিঁড়ি এবং অবাধ্যতার মাধ্যম হবে।

সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা, গবেষণা, ধারণা, ইত্যাদি সকল দিক থেকেই চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ আল্লাহ তায়া'লা তাক্বদীরের বিষয়টিকে সকল সৃষ্টি থেকে গোপন রেখেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে বারণ করে দিয়েছেন।

৬. আখেরাতঃ আমাদের আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে কিয়ামত, পুনরুত্থান, হিসাব, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখা তথা এসব বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা এবং এসব বিষয়কে মন থেকে মেনে নেওয়া। এটা হচ্ছে ঈমানের ৬টি মূলনীতির ৬ষ্ঠ মূলনীতি। সহজ ভাবে বুঝার জন্য এ বিষয়টিকে আমরা কয়েকটি ভাগে উপস্থাপন করব। যেমন..

ক. কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ঃ কিয়ামত বা মহাপ্রলয় বলতে আমরা সাধারণত এ মহাবিশ্বের ধ্বংসলীলাকে বুঝি। অর্থাৎ এমন এক দিন আসবে যখন মহান স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেবেন। আর এ মহাপ্রলয়ের জন্য তিনি তৈরি রেখেছেন এক মহাশিঙ্গা। মহাপ্রলয়ের মহা ধ্বংসলীলা বাস্তবায়িত হবে মহাশিঙ্গার একটিমাত্র ফুঁৎকারের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50)

তারা (কাফিররা মুত্তমিনদেরকে) আরো বলেঃ তোমরা সত্য হলে (বলো! কিয়ামত, হাশর, হিসাব, জান্নাত, জাহান্নাম) এসব প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? (তাদের এমন প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন..)
আসলে তারা অপেক্ষা করছে একটিমাত্র গর্জনের (তথা মহাশিঙ্গায় মহা ফুঁৎকারের) আর এটা যখন চলে আসবে তখনো তারা বিবাদে রত থাকবে। তখন (মুহূর্তে সব ধ্বংস হয়ে যাবে) তারা পরস্পরকে উপদেশ দিতেও সক্ষম হবে না আর আপন পরিবারের কাছে ফিরে যেতেও পারবে না। (৩৬ ইয়াসীনঃ ৪৮-৫০)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68)

আর যখন (১ম বার) শিঙ্গা ফুঁকা হবে তখন আসমানে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে সবাই (মরে) অচেতন হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের চান (তারা মরবে না) তারপর যখন পুনরায় শিঙ্গা ফুঁকা হবে তখন সবাই উঠে দেখতে থাকবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৮)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে। ১ম শিঙ্গা ফুঁকার সময় সবাই মরে গেলেও জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল এবং মালাকু-ল-মাওত এ চারজন ফিরিস্তা মরবে না। পরে পর্যায়ক্রমে তিন জনের মৃত্যু হবে।
(এ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীছ আছে, হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তাফসীর কুরতুবী, তাবারী এবং তিরমিযীর তাফসীর অধ্যায়ে। আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৩য় বই "যেভাবে ঈমান ঈমান আনতে হয়" এর ফিরিস্তাদের উপর ঈমান অধ্যায়েও হাদীছটি উল্লেখ আছে।)

খ. পুনরুত্থানঃ মহাপ্রলয়ের পর চলে যাবে দীর্ঘ সময়। তারপর হবে পুনরুত্থান। পুনরুত্থান সংঘটিত করানোর জন্য ২য় বার পুনরায় সেই মহাশিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। তবে এ ফুঁ ধ্বংসের জন্য নয় বরং ধ্বংসপ্রাপ্ত সবকিছুকে পুনরায় জীবন দান করার জন্য। আর এ পুনরায় জীবন দান করাকে-ই বলা হয় পুনরুত্থান। ইরশাদ হচ্ছে..

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54)

(দ্বিতীয় বার) শিঙ্গা ফুঁকা হলে তারা কবর/মাটির নীচ থেকে উঠে প্রভুর দিকে ছুটে চলবে। (১ম ফুঁৎকারের পর ২য় ফুঁৎকার পর্যন্ত পাপিষ্ঠদের কবরের আযাব বন্ধ রাখা হবে এবং সবাই নিদ্রিত থাকবে -জালালাইন, তাই ২য় ফুৎকারের পর সবাই ঘুম থেকে উঠে ছুটে চলবে তখন..)
তারা বলবেঃ সর্বনাশ! সর্বনাশ! আমাদেরকে নিদ্রা থেকে কে জাগ্রত করেছে? (তখন তারা বলাবলি করবে /তাদেরকে বলা হবে) এটা-ই রাহমানের প্রতিশ্রুতি, রাসূলগণ সত্য বলে ছিলেন।
এটা (পুনরুত্থান) আসলে একটিমাত্র গর্জন। তৎক্ষণাৎ সবাই উঠে আমার কাছে হাজির হবে। (তখন ঘোষণা করা হবে) আজ কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না। তোমরা যে যা করেছ আজ তোমাদেরকে এসবের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (৩৬ ইয়াসীনঃ ৫১-৫৪)

গ. হিসাব, বিচার, জান্নাত ও জাহান্নামঃ পুনরুত্থানের পর শুরু হবে হিসাব ও বিচার। দুনিয়ার জীবনে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের রেকর্ড রাখা হচ্ছে। ফিরিস্তাগণ তখন প্রতিটি মানুষের রেকর্ডবুক /রিপোর্ট বই /আমলনামা পেশ করবে। সবাইকে নিজ নিজ রিপোর্ট বই দেওয়া হবে এবং বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হবে আর এ রায়ের ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে আমাদের চিরস্থায়ী আবাসনের। কেও যাবে জান্নাতে আর কেও জাহান্নামে। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26)

নিশ্চয় আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন এবং আমার দায়িত্বেই তাদের হিসাব গ্রহণ/জবাবদিহিতা। (৮৮ গাশিয়াহঃ ২৫-২৬)

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)

সেদিন (বিচারের দিন) সকলের সবকিছু উন্মুক্ত হয়ে যাবে, কারো কোনোকিছুই আল্লাহ থেকে গোপন থাকবে না। (সেদিন উন্মুক্ত ময়দানে জিজ্ঞেস করা হবে) আজকের এ দিনে সার্বভৌম ক্ষমতা কার? (সব দিক থেকে আওয়াজ উঠবে) মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহর। (তখন ঘোষণা করা হবে আজ ১০০% ন্যায় বিচার হবে এবং) আজ সবাইকে নিজ নিজ কর্মফল দেওয়া হবে, আজ (কারো প্রতি) সামান্যতম অবিচার হবে না। আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০ গাফিরঃ ১৬-১৭)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16)

(পরকালে) অবশ্যই নেক লোকেরা থাকবে নিয়ামতপূর্ণ (জান্নাতে) আর পাপিষ্ঠরা থাকবে জাহী'মে (তথা প্রজ্বলিত জাহান্নামে।) প্রতিদান দিবসে সবাই সেখানে দাখিল হবে, কেউ সেখান থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না। (৮২ ইনফিত্বারঃ ১৩-১৬)

বিঃ দ্রঃ = আসলে ঈমানের মৌলিক বিষয় ৬টি। যথা..

১. আল্লাহর উপর ঈমান
২. ফিরিস্তাগণের উপর ঈমান
৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান
৪. আল্লাহর রাসূলগণের ঈমান ঈমান
৫. তাক্বদীরের উপর ঈমান
৬. কিয়ামত, পুনরুত্থান ও আখেরাতের উপর ঈমান।

এ ছাড়াও আল্লাহ থেকে আগত এবং রাসূল সা.র কর্তৃক আনীত সকল বিষয়েই ঈমান আনতে হয়। আমরা এসব থেকে মাত্র দুটি বিষয় (তাক্বদীর ও আখেরাত) অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছি। বাকি বিষয়গুলো উল্লেখ করিনি। কারণ আমাদের এ কোর্সের নাম "শারীয়া'হ কোর্স" আর ঈমান সংক্রান্ত বিষয়গুলো আসলে ঈমান আক্বীদাহ কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এসব বিষয়কে আমরা সবিস্তারে "ইসলাম শিক্ষা কোর্স" এ আলোচিত হয়েছে এবং ঈমানের এ ৬টি মৌলিক বিষয় নিয়ে আমরা "যে ভাবে ঈমান আনতে হয়" নামে আলাদা একটি বই সংকলন করেছি। বিষয়গুলোকে সবিস্তারে জানার জন্য বইটি অধ্যয়নের আবেদন রইল।

অনুচ্ছেদঃ ৬. ইস্তিক্বামত তথা ঈমানের উপর অবিচল থাকা

ঈমান গ্রহণের পর আমাদের অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হল ইস্তিক্বামত তথা ঈমানের উপর অবিচল থাকা। ঈমান হলো অনন্ত জীবনে নিশ্চিত জান্নাত লাভের একমাত্র পথ। তবে আখেরাতের জীবনে ঈমানের ফল ভোগ করতে হলে অবশ্যই ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হয়। ঈমানের উপর অবিচল থাকার অর্থ হল ঈমান আনার পর..

- ঈমানের পথে চলা (তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলা)
- ঈমান বিনষ্টকারী পাপসমূহ থেকে বিরত থাকা
- মৃত্যু পর্যন্ত এ পথে অটল ও অবিচল থাকা।

এমনি ভাবে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকতে পারলে আখেরাতে ঈমানের ফল প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13)

যারা বলেঃ আমাদের রাব্ব (বিধানদাতা) হলেন আল্লাহ অতঃপর (মৃত্যু পর্যন্ত) এর উপর অটল ও অবিচল থাকে (অর্থাৎ ঈমানের উপর অবিচল অবস্থায় যাদের মৃত্যু হবে) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা পেরেশানও হবে না। (৪৬ আহক্বাফঃ ১৩)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

وعن مُعاذ بن جبلٍ قال كنتُ رديف النبيِّ ﷺعلى حمارٍ فقال لي يا معاذ، أتدري ما حقّ الله على العباد؟ وما حقّ العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنَّ حقَّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا، وحقَّ العباد على الله أن لا يُعذِّب مَن لا يُشرك به شيئًا، قلت :يا رسول الله، أفلا أُبشر الناس؟ قال :لا تُبَشِّرهم فيتَّكلوا. أخرجاه في "الصحيحين."

মুয়া'য বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি এবং রাসূল সা. একটি গাধার উপর আরোহ করেছিলাম। আমি নবী সা.র পিছনে বসা ছিলাম। একদা তিনি বললেনঃ মুয়া'য! তুমি কী জানোঃ বান্দার উপর আল্লাহর কী অধিকার রয়েছে আর আল্লাহর উপর বান্দার কী অধিকার রয়েছে?

আমি বললামঃ আল্লাহ ও রাসূলই ভালো জানেন।

রাসূল সা. বললেনঃ বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হলো বান্দা শুধু-ই আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং অন্যকে আল্লাহর শরীক বানাবে না তথা শিরক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হলো বান্দা যদি শিরক না করে তবে আল্লাহ তাকে (জাহান্নামে) আযাব দেবেন না।

আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কী লোকজনকে এ সু-সংবাদটি জানিয়ে দেব না?

তিনি বললেনঃ না, তুমি জানাবে না। কারণ এতে তারা (আ'মাল ও ইবাদাত না করে) এর উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে যথাযথ ভাবে ঈমান আনার পর বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।

عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه **قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم** . رواه مسلم في صحيحه .

সুফইয়ান বিন আব্দুল্লাহ আল-সাক্বাফী রা. বলেনঃ একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের ব্যাপারে আমাকে এমন কিছু বলুন যেন আপনার পর আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি বললেনঃ বলো! "আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম"। অতঃপর এর উপর অবিচল থাকো। (সাহীহ মুসলিম)

ঈমানের উপর অবিচল থাকার উপায়ঃ মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে তথা ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে নিজের আখেরাতকে নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো নিতে হবে। যথা..

১. আদর্শগতভাবে যাবতীয় কুফর শিরক ত্যাগ করে ঈমানের পথে ফিরে আসতে হবে; ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় তাওবাহ
২. কুফর শিরকের সকল উপকরণ বর্জন করতে হবে; (কারণ কুফর শিরক ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। আর এটা হল ত্বাগূত বর্জন)
৩. সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ ও রাসূল থেকে আসা যাবতীয় বিষয়াদির উপর অবিচল বিশ্বাসী হতে হবে; (আর নাম আক্বীদাহ, কারণ আল্লাহ ও রাসূল থেকে নিশ্চিত ভাবে পাওয়া কোনো বিষয়ে সন্দেহ করা কুফর।)
৪. অন্তরকে যাবতীয় কুফর শিরক থেকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ রাখতে হবে; (এর নাম তাযকিয়্যাহ)
৫. নিজের অন্তরে ঈমানকে ধরে রাখতে হবে বা লালন করতে হবে; (এর নাম ইস্তিক্বামত)
৬. ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে; (এর নাম তাকওয়া)
৭. বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে; (এর নাম আ'মাল)
৮. আল্লাহর বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর শত্রুর সাথে শত্রুতা করতে হবে; (এটা হল আল- ওয়ালা ওয়া-ল-বারা)
৯. সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে হবে; (এটি তাকওয়ার অংশ)
১০. আল্লাহ্ ও রাসূলকে অন্য সকলের চেয়ে এবং সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসতে হবে;
১১. আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে এবং জিহাদকে সমর্থন করতে হবে; (কারণ জিহাদ অপছন্দ করা মুনাফিকী)
১২. নিজের ইসলাম, ঈমান, আমল, ইবাদাত, স্বভাব, চরিত্র, আচার ব্যবহার ও কথাবার্তাকে সুন্দর করতে হবে; (এর নাম ইহসান)
১৩. যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকতে হবে; (এর নাম সবর)
১৪. সনাতন ও আধুনিক সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে; (এটি তাকওয়ার অংশ)
১৫. সনাতন ও আধুনিক সকল প্রকার কুফর থেকে বেঁচে থাকতে হবে; (এটি তাকওয়ার অংশ)
১৬. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে; (এর নাম হিফজুলদ্দীন বা হিফজুল ঈমান)
১৭. সামাজিক ও জাতীয় আনুগত্য এবং অনুকরণের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে;
১৮. দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে;
১৯. মানবরচিত বা মনগড়া নীতিমালা বিধিবিধান ও তরিকা থেকে বিরত থাকতে হবে; (এটি হল ত্বাগূত বর্জনের অংশ)
২০. সমাজের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়, সাম্য তথা ইনসাফ বজায় রাখতে হবে, নিজের স্বভাব চরিত্রে বিনয়ী হতে হবে এবং ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে।

বিঃ দ্রঃ = আসলে ঈমানের উপর অবিচল থাকা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি একটি বিরাট বিষয়। এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ব্যাপারে আমরা একটি স্বতন্ত্র বই রচনা করেছি। বইটির নাম "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের বইটি অধ্যয়নের আহ্বান রইল।

অনুচ্ছেদঃ ৭. তাকওয়া

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা। আমাদের সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করতে হবে। সুতরাং আসুন! তাকওয়া সম্পর্কে একটু স্ববিস্তারে জেনে নেই।

শব্দ পরিচিতিঃ তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ (**وقاية**) অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা, ইত্যাদি। ইরশাদ হচ্ছে..

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24)

..সুতরাং (হে জিন্ন ও ইনসান!) তোমরা সবাই (আল-কুরআনের আনুগত্য করে) ওই আগুন থেকে বাঁচো, যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। যা তৈরি করা হয়েছে কাফিরদের তরে। (২ বাক্বারাহঃ ২৪) এখানে তাকওয়া শব্দটি বেঁচে থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাকওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার বা বিরত থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করল তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

১ম স্তরঃ অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে ফরজ দায়িত্ব হিসেবে এমন তাকওয়া অর্জন করতে হবে। কারণ সনাতন বা আধুনিক কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে গেলে ওই ব্যক্তির ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)

পটভূমিঃ উবাই বিন শারীক্ব মদীনার এক ধূর্ত লোক। বাহ্যত মুসলিম হলেও তার সখ্যতা ছিল কাফিরদের সাথে। সাহাবাদের কাছে সে আখনাস নামে পরিচিত ছিল। আখনাস অর্থ পলায়নকারী। বদর যুদ্ধে বানী-যুহরার ৩০০লোক নিয়ে পালিয়ে ছিল বিধায় তাকে আখনাস বলা হত।
আখনাস ছিল খুবই মিষ্টভাষী এবং কথায় পটু। সাহাবাগণ যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলে সে বাহ্যত নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ করে এবং বলেঃ আমার অন্তরের খবর আল্লাহ জানেন, আমি সত্য বলছি। (রাসূল সাঃ তাকে তাকওয়ার উপদেশ দিলেন। বাহ্যত তাওবাহ করলেও ভিতরে ভিতরে সে অপমান বোধ করল এবং মুসলিমদের প্রতি তার হিংসা ও জ্বালা আরো বেড়ে গেল। কিছু করতে না পেরে) হিংসার জ্বালায় সে গোপনে মুসলিমদের কয়েকটি গাধাকে মেরে ফেলল এবং কিছু ফসলী জমি নষ্ট করল। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলঃ (কুরতুবী)

দুনিয়ায় এমন লোকও আছে যে কথা দিয়ে তোমাকে মুগ্ধ করে ফেলবে এবং তার অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী বানাবে কিন্তু আসলে সে চরম ঝগড়াটে। সে ফিরে গিয়ে যমীনে ফাসাদ করে, নষ্ট করে ফসল ও নসল (বংশ।) অথচ আল্লাহ কোনো প্রকার ফাসাদ পছন্দ করেন না। তাকওয়ার কথা বলা হলে পাপিষ্ঠের ইজ্জতে লাগে। (যে ব্যক্তি এমন হয়ে যায়) তার জন্য জাহান্নাম-ই যথেষ্ট, নিকৃষ্টতম আবাস। (২ বাক্বারাহঃ ২০৪-২০৬)

২য় স্তরঃ আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হল সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)

..তোমরা সবাই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর আর মনে রেখো! আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (২ বাক্বারাহঃ ১৯৬)

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ ও বদ-স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ্-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এমন তাওয়ার অধিকারী করতে পারেন। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর, যথাযথ তাকওয়া। আর (শোনো! পরিপূর্ণ ভাবে) আত্মসমর্পণ না করে যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১০২)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত নাযিলের পর সাহাবাগণ ভাবনায় পড়ে গেলেন, বললেনঃ এমন সাধ্য কার আছে (যে যথাযথ ভাবে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে)? রাসূল সাঃ বললেন আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ কর। সাহাবাগণ আল্লাহর বিধানকে পরিপূর্ণ ভাবে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণের ঘোষণা দিলেন। পরে নাযিল হলঃ তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী। (তাগাবুনঃ ১৬) অর্থাৎ সূরাহ তাগাবুনের আয়াত দ্বারা উক্ত আয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়েছে।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)

আর তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে (আল্লাহর কথা) শুনবে এবং আনুগত্য করবে। আর (আল্লাহর পথে) খরচ করবে (এতে কার্পণ্য করবে না।) এটা-ই তোমাদের জন্য উত্তম। কারণ যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হবে কেবল তারাই সফল হতে পারবে। (৬৪ তাগাবুনঃ ১৬)

তাকওয়া ও মুত্তাক্বী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আরো কিছু তথ্য

১. মুঅমিনের জন্য তাকওয়া হলো আবশ্যক বিষয়। তাকওয়া ব্যতীত মুঅমিন হওয়া যায় না এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকা যায় না। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা এমন কাউকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না, যারা তোমাদের দ্বীন নিয়ে হাসি-তামাশা করে, তারা তোমাদের আগেকার আহলে কিতাব হোক অথবা

কাফির। (কারণ এসব হলো তাক্বওয়া পরিপন্থী কাজ।) আর মুঅমিন হতে চাইলে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করতে হবে। (দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-কৌতুক করা কুফর) (৫ মা-ইদাহঃ ৫৭)

২. তাকওয়া অর্জন করতে পারলে আল্লাহ্ আপনাকে ফুরক্বান দান করবেন। তখন ভালো মন্দ যাচাই করা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)

ওহে যারা ঈমান এনেছি! (শুনো!) তোমরা সবাই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর। (তাকওয়া অর্জন করতে পারলে) তিনি তোমাদেরকে ফুরক্বান (ভালো-মন্দ নির্ণয়ের সঠিক জ্ঞান) দান করবেন, তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ হলেন মহা অনুগ্রহশীল। (৮ আনফালঃ ২৯)

জ্ঞাতব্যঃ ফুরক্বান হচ্ছে ভালো ও মন্দ নির্ধারন করার মত আধ্যাত্মিক শক্তি বা জ্ঞান। যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করতে পারবে আল্লাহ তাকে ফুরক্বান দান করবেন। তখন সে নিজেই ভালো ও মন্দেকে আলাদা করে বুঝতে পারবে। আর হয়ত এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূল সা. ওয়াবিস্বাহ রা.কে বলেছিলেনঃ ওয়াবিস্বাহ! অন্যকে জিজ্ঞেস করার আগে প্রথমে নিজের মনকে জিজ্ঞেস কর...। (মুসনাদে আহমদঃ ১৮০০৬। হাদীছটি দীর্ঘ, হাদীছটি সাহীহ)

৩. আপনি মুত্তাক্বী হয়ে গেলে আল্লাহ্ আপনার সঙ্গী হয়ে যাবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

..তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর আর জেনে রাখো! আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সঙ্গী। (২ বাক্বারাহঃ ১৯৪)

৪. আপনি তাক্বওয়া অর্জন করতে পারলে আল্লাহ আপনার রিজকের জিম্মাদার হয়ে যাবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

...যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আল্লাহ্ তার জন্য পথ খুলে দেবেন এবং এমন জায়গা থেকে রিজক দান করবেন যা সে কল্পনাই করতে পারবে না।... (৬৫ ত্বালাক্বঃ ২-৩)

৫. আল্লাহ্ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই তাদের আ'মাল ও ইবাদাত কবুল করে থাকেন। সুতরাং আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলেই কেবল আল্লাহ্ আপনার আ'মাল ও ইবাদাত কবুল করবেন নতুবা আপনার আ'মাল ও ইবাদাত কবুল হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা থাকবে না। ইরশাদ হচ্ছে...

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27)

(হে নবী!) তাদের কাছে বর্ণনা কর আদমের দুই ছেলের (হাবিল ও কাবিলের) কাহিনী। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল এবং একজনের (হাবিলের) কুরবানী কবুল করা হল আর অন্যজনের (কাবিলের কুরবানী) কবুল করা হল না। (কাবিল এ জন্য হাবিলকে দায়ী করল) সে বললঃ আমি তোমাকে মেরে ফেলব। (হাবিল) বললঃ (তোমার কুরবানী কবুল হয়নি। এ জন্য আমি দায়ী নয়। তুমি পাপ ছেড়ে মুত্তাক্বী হয়ে যাও। তবেই তোমার কুরবানী কবুল হবে। কারণ) আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই (তাদের আ'মাল) কবুল করে থাকেন। (পাপিষ্ঠরা সর্বদাই নিজের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করে) (৫ মা-ইদাহঃ ২৭)

জ্ঞাতব্যঃ যতটুকু তাকওয়া না হলে আমল কবুল হয় না তা হচ্ছে ১ম শ্রেনীর তাকওয়া (তথা আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর ও শিরিক থেকে বিরত থাকা।) কারণ এতোটুকু তাকওয়া না থাকলে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়, তখন তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় ফলে তার কোনো কিছুই আর কবুল করা হয় না।

৬. আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আল-কুরআন আপনার সঙ্গী হয়ে যাবে এবং আপনাকে জান্নাতে পৌঁছানো পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে...

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)

ওই কিতাবে (আল-কুরআনে) সন্দেহের কোনো অবকাশও নেই। (এ কুরআন হলো) মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত (তথা তাদেরকে জান্নাতে পৌছে দেবে।) (২ বাক্বারাহঃ ২)

৭. আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আল্লাহ্ আপনার সকল পাপ মোচন করে দেবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)

এটা-ই আল্লাহর হুকুম /আল্লাহর দ্বীন /আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। আর (এর দ্বার কথা হচ্ছে) যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে দান করবেন মহা পুরস্কার। (৬৫ ত্বালাক্বঃ ৫)

৮. তাক্বওয়া সফলতার চাবিকাঠি। আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আপনার জীবন সফল হবে এবং আপনি হয়ে যাবেন চির জান্নাতী। ইরশাদ হচ্ছে..

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)

(হে মানব ও দানব!) তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে চলো, যার প্রশস্ততা হলো আসমান যমীন (সমতুল্য) যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৩৩)

সুতরাং বুঝতেই পারছেন জান্নাতে যাওয়ার মূল বিষয়ই হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়া তথা ঈমান আনার পর আল্লাহর ইবাদাত করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা।

অনুচ্ছেদঃ ৮. ইহসান

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি নৈতিক ও আদর্শিক ফরজ দায়িত্ব হলো ইহসান করা। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)

..আর তোমরা (জীবনের সকল ক্ষেত্রে) ইহসান করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের ভালোবাসেন। (২ বাক্বারাহঃ ১৯৫)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ (83)

আর (স্মরণ কর) যখন আমরা বানী-ইসরাঈল থেকে (কয়েকটি বিষয়ে) অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। (বিষয়গুলো হল..)

- তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো ইবাদাত করবে না,
- বাবা-মা আত্মীয়স্বজন ও এতীম মিসকিনের (তথা সকলের) সাথে ইহসান করবে।
- আর তোমরা মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলবে,
- সালাত কায়েম করবে
- এবং যাকাত আদায় করবে।

এতদসত্ত্বেও তোমরা অল্প কজন ছাড়া বাকি সবাই (আমার সাথেকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরে) ফিরে গিয়েছো, তোমরা (আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (২ বাক্বারাহঃ ৮৩)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)

তোমরা (মানব ও দানব জাতি) ইবাদাত করবে শুধুই আল্লাহর, আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার শিরক করবে না। আর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি সঙ্গী (সফর সঙ্গী /জীবন সঙ্গী,) পথিক আর অধীনস্থ সকলের সাথে ইহসান (সুন্দর ব্যবহার) করবে। (আর দম্ভ করবে না। কারণ) কোনো অহংকারী দাম্ভিককে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (৪ নিসাঃ ৩৬)

ইবাদাত পরিচিতিঃ এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে..

- নিজের উপর মহান আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিতে হয় তথা মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কারো প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া যাবে না।
- পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনতে হয় তথা আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া যাবতীয় বিধিবিধান ও তথ্যসমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় এবং এর বিপরীতে কোনো কিছু বিশ্বাস করা যাবে না।
- আল্লাহর দেওয়া ও রাসূলের আনীত যাবতীয় আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে নৈতিক ও আদর্শিক ভাবে মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কোনো আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান, রীতিনীতি বা মতবাদ মেনে নেওয়া যাবে না।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে এককভাবে মহান আল্লাহ প্রদত্ব দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা ও বিধিবিধানকে নীতিগত ভাবে মেনে চলতে হয়।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা বা অংশীদার বানানো। শিরক মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কিন্তু তথাপি সমাজের অনেক মানুষ-ই শিরক করে থাকে। আমাদের সমাজে আল্লাহর সাথে শিরক নানা ভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক হয়
- আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়
- আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হয়
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়
- আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যকে বিচারক/শাসক হিসেবে মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়
- আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।
- উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক।
- আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়
- মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে
- কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।

অধিকারঃ উত্তম ব্যবহার আত্মীয় অনাত্মীয়, ধনী গরীব, পরিচিত অপরিচিত সকলের অধিকার। তাই সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় অধিকার নষ্টের অপরাধে অপরাধী হতে হবে তথা জালিম হিসাবে চিহ্নিত হবে।

ইহসান ও মুহসিন পরিচিতিঃ মুহসীন অর্থ ইহসানকারী। যে ব্যক্তি ইহসান করে বা ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহসিন" বলা হয়। আর "ইহসান" অর্থ সুন্দর করা।

- ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, কথাবার্তা, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহসান" বলা হয়।
- হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করে ছিলেন "ইহ'সান" কি? উত্তরে রাসূল সা. বলে ছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমন ভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ আর যদি এমন হতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।

উল্লেখ্য..

- নিজের ঈমানকে সুন্দর করতে হলে শুধুমাত্র যথাযথ দলীল তথা ক্বাত্বয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে-ই ঈমান ও আক্বীদায় স্থান দিতে হবে। উল্লেখ্য আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছকে বলা হয় ক্বাত্বয়ী (অকাট্ট) দলীল। এ দুই প্রকার দলীল ছাড়া অন্য কোনো ভাবে প্রমাণিত বিষয় আমাদের ঈমান আক্বীদাহর অংশ হবে না। এ ব্যাপারে সকল ঈমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
- নিজের ইসলামকে সুন্দর করতে হলে মানব রচিত ও মনগড়া সকল কিছু বর্জন করতে হবে এবং একমাত্র জীবন আদর্শ হিসেবে শুধু ইসলামকেই মেনে নিতে হবে আর সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত থেকে দলীল ভিত্তিক কাজ করতে হবে এবং বাস্তব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে।
- ইবাদাত সুন্দর করার পদ্ধতি হলো "আল্লাহর ইবাদাত এমন ভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ আর যদি এমন হতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।
- আদব আখলাক সুন্দর করতে হলে সভ্য ও ভদ্র হতে হবে
- স্বভাব চরিত্র সুন্দর করতে হলে সকল প্রকার পাপাচার ও বদ-স্বভাব পরিহার করতে হবে
- কথাবার্তা সুন্দর করতে হলে বিনয়ী ও নম্র হতে হবে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৯. সবর

আমাদের উপর আরো একটি নৈতিক ও আদর্শিক ফরজ দায়িত্ব হল "সবর" করা। আমাদেরকে সবরের আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো! তোমরা আল্লাহর পথে) সবর করবে তথা অটল থাকবে, অবিচল থাকবে, (যুদ্ধকালীন সময়ে এবং সীমান্ত পাহারায় সদা) তৎপর থাকবে আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে, এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২০০)

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)

আর যারা স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল, বিপদ-মুসীবত/রোগব্যাধি তথা সর্বাবস্থায় এবং যুদ্ধকালীন সময়ে সবর করে (তথা নিজের ঈমান ইসলাম ও নীতি আদর্শের উপর অটল ও অবিচল থাকে ঈমানের দাবীতে কেবল) তারা-ই সঠিক আর তারা-ই তাকওয়া অর্জনকারী (হিসেবে বিবেচিত হবে।) (২ বাক্বারাহঃ ১৭৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর সবর এবং সালাতের মাধ্যমে। যারা সবর করে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গী হন। (২ বাক্বারাহঃ ১৫৩)

জ্ঞাতব্যঃ বিপদে মুসীবতে সবর করতে হয় এবং সালাত আদায় করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হয়। এটা-ই আল্লাহর সাহায্য কামনার সঠিক পদ্ধতি আর এটা-ই হলো আল্লাহর ও রাসূল সা.'র প্রদর্শিত সাহায্য চাওয়ার সঠিক পথ।

একটি ভুল সংশোধনঃ বিপদ-আপদে দোয়া চাওয়া এবং সাদাকাহ দেওয়া ভালো কাজ। তবে টাকা পয়সা বা অন্য কোনো বিনিময় দিয়ে দোয়া করানো সুন্নতের পরিপন্থী এবং বিদয়া'ত কাজ যা বিধর্মীদের অনুকরণে আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে। বিপদে পড়ে মিলাদ পড়ানো, খতম পড়ানো, ইত্যাদি কাজসমূহও সুন্নতের পরিপন্থী বিদয়া'ত কাজ। বিদয়া'ত মানুষকে জাহান্নামের পথে ধাবিত করে।

সবর পরিচিতিঃ সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250)

(কাফির নেতা) জালূত ও তার বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে তারা বলল হে রাব্ব! আমাদের উপর সবর (দৃঢ়তা) ঢেলে দাও, আমাদের অবস্থানকে মজবুত কর এবং কাফিরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর। (তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিল এবং আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করলেন) (২ বাক্বারাহঃ ২৫০)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35)

(রাসূল সা.কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়া'লা আদেশ দিচ্ছেন) সবর কর, যেমন সবর করেছেন দৃঢ়চেতা রাসূলগণ। আর তাদের (কাফিরদের) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না। তারা যেদিন প্রতিশ্রুত (আযাব) দেখে ফেলবে সেদিন (মনে করবে) যেন দিনের সামান্য সময় (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে। (এটা এক) চূড়ান্ত ঘোষণাঃ পাপিষ্ঠ জাতি ছাড়া আর কাওকে-ই (চিরতরে) ধ্বংস করা হবে না। (৪৬ আহক্বাফঃ ৩৫)

সবরের প্রতিদানঃ যারা সবর করবে মহান আল্লাহ তাদেরকে বে-হিসাব পুরস্কার দেবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10)

(হে নবী! আমার পক্ষ থেকে) ঘোষণা করে দাওঃ হে আমার ঈমানদার বান্দারা! প্রভুর তাকওয়া অর্জন কর। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া)
(মনে রেখো!) এ দুনিয়ায় যারা ভালা কাজ করবে (আখেরাতে) তাদের প্রতিদান হবে কতই উত্তম। (শুনো!) আল্লাহর যমীন উন্মুক্ত (তাই এক জায়গায় আল্লাহর ইবাদাত করতে অসুবিধা হলে অন্যত্র চলে যাও আর আগত মুসীবতে সবর কর।) নিশ্চয় সবরকারীদের প্রতিদান হবে বে-হিসাব। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অনড় ও অবিচল থাকার নাম সবর।) (৩৯ যুমারঃ ১০)

অনুচ্ছেদঃ ১০. শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ

আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি নৈতিক ও আদর্শিক ফরজ দায়িত্ব হল শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ করা তথা শত্রুকে শত্রু আর মিত্রকে মিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা এবং বাস্তব জীবনে এসব বিষয় মেনে চলা। শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ করা আমাদের জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো ইসলামী বিধানে এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঈমান ও আক্বীদাহর পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া আল-বারা-"।
ইসলামী রীতিনীতি অনুযায়ী শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের মূলনীতি হচ্ছে "ঈমান ও কুফর"। অর্থাৎ আল্লাহর শত্রু-ই আমার শত্রু আর আল্লাহর মিত্র-ই আমার মিত্র। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদেরকে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবনসহ আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতেও এসব রীতিনীতি মেনে চলতে হবে।

আমাদের আসল মিত্র হলেন একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা। তিনিই আমাদের মালিক, তিনিই আমাদের বিধানদাতা রাব্ব এবং তিনিই আমাদের অভিভাবক ও একমাত্র নীতি নির্ধারক। আর আল্লাহর দেওয়া রীতি আনুযায়ী রাসূল সা. এবং দুনিয়ার সমস্ত মুঅমিনগণ হলেন আমাদের মিত্র ও অভিভাবক। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন..

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55)

(মুঅমিনগণ! মনে রেখো! কর্তৃত্বশীল ও নীতি নির্ধারক হিসেবে) তোমাদের ওয়ালী হলেন একমাত্র আল্লাহ্ এবং (অভিভাবক হিসেবে তোমাদের ওয়ালী হলেন) রাসূল আর (পরস্পরে দায়িত্বশীল হিসেবে তোমাদের ওয়ালী হল) ওই সকল মুঅমিনগণ যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর তারা হয় রুকুকারী (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে নতিস্বীকারকারী তথা আল্লাহর অনুগত।) (৫ মা-ইদাহঃ ৫৫)

কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের সাথে আমাদের বিষয় ভিত্তিক বা মেয়াদী সন্ধি হতে পারে। তবে স্থায়ী মিত্রতা হতে পারে না। মহান তায়া'লা ইরশাদ করেন..

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)

(আর শোন! তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত নীতি হল) মুঅমিনরা মুঅমিন ছাড়া কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন করবে (তথা মুঅমিন ব্যতীত অন্য কাওকে ওয়ালী বানাবে) আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা প্রতিরক্ষা হিসেবে তাক্বিয়্যাহ করতে পারবে (আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে তাক্বিয়্যাহ বলে।) আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (আযাবের) ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। (মনে রেখো! সবাইকে) আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। (আ-ল ই'মরানঃ ২৮)
জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে মেনে চলার মত আইন ও বিধানের মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এ বিষয়েও সঠিক এবং সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। ইসলামী পরিভাষায় এসব নীতিমালাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" তথা শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের নীতিমালা।

ওয়ালী পরিচিতিঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল, নীতিনির্ধারক, ইত্যাদি। ওয়ালী সম্পর্কে আল-কুরআনে যেসব কথা বলা হয়েছে এর সারসংক্ষেপ হল..
১. আল্লাহ সকল মুঅমিনের ওয়ালী। (বাক্বারাহঃ ২৫৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ সকল মুঅমিনের জন্য একমাত্র কর্তৃত্বশীল নীতিনির্ধারিক।
২. আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ওয়ালী নেই। (বাক্বারাহঃ ১০৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ ছারা অন্যকে কর্তৃত্বশীল বা নীতিনির্ধারিক হিসেবে মানা যাবে না।
৩. এক মুঅমিন অন্য মুঅমিনের ওয়ালী। (তাওবাহঃ ৭১) এর মানে হচ্ছে দুনিয়ার সকল মুঅমিন অন্য সকল মুঅমিনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল মিত্র।
৪. কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানানো যাবে না। (নিসাঃ ১৪৪) এর মানে হচ্ছে কোনো কাফিরকে অভিভাবক বা মিত্র বানানো যাবে না।
৫. যে সব মুসলিম আত্মীয়-স্বজন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসবে তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে গ্রহন করা যাবেনা। (তাওবাহঃ ২৩) এর মানে হচ্ছে তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না।

আমরা কাকে ওয়ালী বানাব আর কাকে বানাব না। এসম্পর্কে মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বীদার পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"। এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন।
"আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে মেনে চলার মত আইন ও বিধানের মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। শত্রু ও মিত্র নির্ধারন মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এবিষয়েও সঠিক এবং সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" তথা শত্রু ও মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ ঈমানের উপর অবিচল থাকা।

যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের টানে মানুষ একে অন্যের দায়ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয়; এমন সম্পর্ককে বলা হয় আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত আর ওই ব্যক্তিকে বলা হয় ওয়ালী। যেমন..

- পিতা সন্তানের ওয়ালী মানে অভিভাবক।
- সন্তান তার বৃদ্ধ বা মৃত বাবা-মার ওয়ালী, মানে দায়ভার বহনকারী বা দায়িত্বশীল।
- লড়াইয়ের ময়দানে একদল অন্যদলের ওয়ালী, তথা মিত্র।
- আল্লাহ্ আমাদের সকলের ওয়ালী, মানে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল।

কে ওয়ালী হবেঃ ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব এবং দায়দায়িত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, সামরিক চুক্তি, নিরাপত্তা চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী (যদি সে মুঅমিন হয়)
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা মুঅমিন হয়)
- কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ মুঅমিনের (আত্মীয় হলেও) ওয়ালী হতে পারে না।
- এমনকি বাবা-মা ভাইবোনসহ পরিবারের লোকজনও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)
- চুক্তির মাধ্যমেও ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধঃ আল-ওয়ালা ওয়া আল-বারা তথা শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের নীতিমালা

প্রারম্ভিক কথাঃ আল-ওয়ালা অর্থাৎ কাউকে আপন বানানো, অভিভাবক বানানো, মিত্র বানানো, অথবা কারো আপন হওয়া, অভিভাবক হওয়া, মিত্র হওয়া। আর আল-বারা- অর্থ কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, কাউকে শত্রু বানানো, কারো সাথে শত্রুতা রাখা।
আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা- হচ্ছে শত্রু ও মিত্র বানানোর নীতিমালা, শত্রুতা ও বন্ধুত্ব করার নীতিমালা, আপন ও পর বানানোর নীতিমালা।

মানুষের স্বভাবঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। সুষ্ঠভাবে জীবন যাপনের জন্য মানুষকে সমাজবদ্ধ থাকতে হয়, সমাজ নিয়ে চলতে হয়, চলতে হয় অন্য মানুষের সাথে, একত্রে একই সমাজে।

গোঁড়ার কথাঃ মহান আল্লাহ্ তার অসীম দয়ায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ **(56)**

আমি জিন্ন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদাতের জন্য। (যারিয়াতঃ ৫৬)

উল্লেখ্য এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তথা যথাযথ ঈমান আনার পর বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।

সৃষ্টির পর এক পর্যায়ে **আল্লাহ্** মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। অর্থাৎ মানুষ ঠিক মত আল্লাহর ইবাদাত করছে কী না? এসব বিষয়ে বাস্তব পরীক্ষার জন্যই মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ **(2)**

তিনিই (তোমাদের জন্য) জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছেন এটা পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মাঝে কে ইহসানের সহিত আমল করে। (মুলকঃ ২)
উল্লেখ্য ইহসান অর্থ সুন্দর করা। নিজের ইসলাম, ঈমান, ইবাদাত ও আ'মাল, স্বভাবচরিত্র, কথাবার্তা, ইত্যাদি সুন্দর করে করার নাম ইহসান।

মহান আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর পর তাদেরকে ভালোমন্দ জ্ঞান দেবার জন্য এবং সঠিক আদর্শে পরিচালনার জন্য অনেক নবী রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এভাবেই মহান প্রভূ মানুষকে বাতলে দিয়েছেন চলার পথ, ঠিক করে দিয়েছেন জীবনের নীতিমালা ও আদর্শ।

যে মানুষ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর আদর্শ মেনে চলবে আখেরাতের অনন্ত জীবনে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন। আর যে মানুষ দুনিয়ার মোহে বিভোর হয়ে নাফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাবে; আখেরাতের অনন্ত জীবনে তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ **(38)** وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ **(39)**

(শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়্যা হারাম খাদ্য গ্রহণ করল) আমি বললামঃ তোমরা সবাই এখান থেকে (দুনিয়ায়) নেমে যাও। (মনে রাখবে) আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত (জীবন বিধান) আসার পর যে ব্যক্তি আমার হেদায়াত মেনে চলবে তার কোনো ভয় নেই এবং (আখেরাতের অনন্ত জীবনে) তাদেরকে কোনো প্রকার পেরেশান হতে হবে না। আর যারা কুফর করবে তথা আমার বিধান অমান্য করবে; তারা হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাক্বারাহঃ ৩৮-৩৯)

শত্রুতার সূচনাঃ ইবলিস ফিরিস্তাদের সাথে থাকত, জান্নাতে বসবাস করত, সুখ শান্তি, মান মর্যাদা কোনোকিছুই কমতি ছিল না তার।
মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ্ মানুষকে খালীফাহর মর্যাদায় ভুষিত করলেন। আল্লাহর হুকুমে ফিরিস্তাকুল মানুষকে সিজদাহ করল, সম্মান জানাল, মর্যাদা দিল, মেনে নিল আল্লাহর খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসেবে।
কিন্তু ইবলিস বিষয়টিকে স্বাভাবিক ভাবে নিল না, সে নেতিবাচক চিন্তা করল, বিষয়টিকে তার অপমান হিসেবে দেখল। তাই সে দম্ভ করল, অহংকার করল, আদমকে সম্মান করতে অস্বীকার করল। অহংকারের বশে সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বসল।
আল্লাহ্ কৈফিয়ত চাইলে সে তার অন্যায় কাজের বৈধতা দেবার জন্য অন্যায়ভাবে যুক্তি দেখাল, সে অবাধ্য হয়ে গেল।
আল্লাহ্ গোস্বা হয়ে তাকে লা'নত করলেন, চিরদিনের জন্য আপন রহমত থেকে বঞ্চিত করে দিলেন। সেদিন থেকে ইবলিস হয়ে গেল শয়তান।

ইবলিস বুঝতে পারল সে ভুল করেছে, সে জানতঃ ভুল সংশোধনের একমাত্র পথ; ক্ষমা প্রার্থনা করা, নত হওয়া। কিন্তু দম্ভ ও অহমিকা তাকে নত হতে দিল না। সে নিজেকে সংশোধন না করে উলটা পথ ধরল, তার অহংকার তখন ঈর্ষায় রূপান্তরিত হল, সে হিংসায় জ্বলে উঠল। ইবলিস তার এমন পরিনতির জন্য অন্যায়ভাবে মানুষকে দায়ী করল, সে প্রতিজ্ঞা করলঃ যে করেই হোক মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করতেই হবে, যে আগুন তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে সে আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে ধ্বংস করাই হবে তার জীবনের একমাত্র মিশন।
তখন থেকেই ইবলিস মানুষের সাথে শত্রুতা শুরু করে দিল, সে নিজেকে মানুষের শত্রু বানিয়ে ফেলে। আর এজন্যই কোনো যৌক্তিক কারণ ব্যতীত শুধু হিংসার বশবতি হয়ে ইবলিস মানুষের সাথে শত্রুতা করে, মানুষকে ধোঁকা দেয়, কুপথে ডাকে।
শয়তানের ডাকে সাড়া না দিলে সে গোস্বায় দাঁত কামড়ায়, হিংসায় জ্বলে উঠে। কিন্তু কি করবে সে? মানুষের উপর তার যে কোনো ক্ষমতা নেই, কুমন্ত্রণা আর ধোঁকা দেওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই তার।

মানব শয়তানঃ উপায় অন্ত না দেখে ইবলিস অন্য পথ বেছে নেয়। সে চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে, সিদ্ধান্ত নেয়; "কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে"। ইবলিস এ কাজে যুগেযুগে একদল মানুষকে তার সঙ্গী বানাতে চেষ্টা করে এবং নানা প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারিত করে কিছু মানুষকে তার সঙ্গী বানাতে সক্ষম হয়।
ওইসব মানুষ তখন ইবলিসের প্রতারণায় পা দিয়ে এবং তার আনুগত্য মেনে নিয়ে ইবলিসের কাজের সঙ্গী হয়ে যায়। যে সব মানুষ ইবলিসের প্রতারণায় কাত হয়ে পাপ পথে তার সঙ্গী হয়ে যায়, তারাও শয়তানে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তাদেরও শয়তান বলা হয়। আর এরাই হলো মানব শয়তান বা শয়তানের মানব বাহিনী।
ইবলিসের প্রধান অস্ত্র ধোঁকা, প্রতারণা ও প্রলোভন। ইবলিস প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারিত করে মানুষের ভিতর লোভ, হিংসা ও দম্ভ ঢুকিয়ে দেয়। আর যে সব মানুষ ইবলিসের ধোঁকায় পা দিয়ে এসব বদ-অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তারা আর সৎপথে ঠিকে থাকতে পারে না বরং তারা সৎপথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এ সব বদ-অভ্যাসের প্রভাবে মানুষ নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়, মানুষ তখন নিজের ইচ্ছায় পাপের পথ বেছে নিয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়।

মানুষে মানুষে শত্রুতাঃ ইবলিস শয়তান হিংসা বশত মানুষের সাথে শত্রুতা করে নিজেকে মানুষের শত্রু বানিয়েছে। তাই আসল শত্রুতা হচ্ছে মানুষে আর শয়তানে। কিন্তু কিছু মানুষ পাপের পথে ইবলিসের সঙ্গী হয়ে শয়তান হয়ে যায় আর এরাই ইবলিসের মানব বাহিনী হিসেবে কাজ করে। এরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়।
যদিও কিছু মানুষ ইবলিসের প্রতারণা থেকে নিজেদের রক্ষা করে আল্লাহর পথে বহাল থাকতে সক্ষম হয়। আর এ ভাবেই মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়ঃ একদল শয়তানের অনুসারী, জাহান্নামী তথা হতভাগা আর একদল আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী, জান্নাতী তথা ভাগ্যবান। ইরশাদ হচ্ছে..

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)

যে দিন এটা (হাশর ও বিচার) চলে আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। সে দিন কেও হবে হতভাগা আর কেও হবে ভাগ্যবান। হতভাগারা সে দিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তারা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে যতক্ষণ আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে। তবে আল্লাহ যখন চাইবেন (তখন ফাসিকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন) তোমার রাব্ব যা খুশী তাই করেন/করতে পারেন। (১১ হূদঃ ১০৫-১০৭)

জ্ঞাতব্যঃ জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। নাস্তিক, মুশরিক, কাফির, মুনাফিক ও ফাসিক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজন জাহান্নামে যাবে। এর মাঝে ফাসিক শ্রেণীর লোকেরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাদের বের করা হবে। আর নাস্তিক, মুশরিক, কাফির ও মুনাফিক শ্রেণীর লোকেরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

আর যারা ভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতে যাবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান যমীন বিদ্যমান থাকবে (আরবদের বাচন ভঙ্গি হিসেবে চিরকাল বুঝাতে আসমান যমীন বিদ্যমান থাকার কথাটি ব্যবহৃত হয়) তোমার প্রভূর অনুদান অন্তহীন। (১১ হূদঃ ১০৮)

যে সব মানুষ ইবলিসের ধোঁকায় পা না দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় তাদের ব্যাপারে ইবলিস সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। তাই তাদের পিছনে তার মানব বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়, লেলিয়ে দেয় মানব শয়তানদেরকে। আর এ মানব শয়তানরা আল্লাহর বান্দাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাদের বদনাম করে, কুৎসা রটনা করে, প্রপাগান্ডা করে, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে আল্লাহর বান্দাদের জীবনকে করে তুলে দুর্বিষহ।

তাতেও কাজ না হলে শয়তানরা মরিয়া হয়ে উঠে, শুরু হয় জেল জুলুমসহ নানা অত্যাচার ও নিপীড়ন। সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে তারা আল্লাহর বান্দাদের হত্যা করে দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলতে সরাসরি আক্রমণ শুরু করে। ফলে নষ্ট হয় পরিবেশ, ধ্বংস হয় সামাজিক শান্তি ও সৃংখলা, তৈরি হয় মানুষে মানুষে শত্রুতা, শুরু হয় যুদ্ধবিগ্রহ। মানুষ তখন দুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ে। একদল আল্লাহর পথে আর একদল শয়তানের পথে। ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)

যারা ঈমান আনে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কুফর করে তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে। সুতরাং (হে মুআমিনগণ!) তোমরা শয়তানের আওলিয়াদের (মিত্রদের, চামচাদের) সাথে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল হয়ে থাকে। (আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও শক্তিকে ত্বাগূত বলা হয়।) (৪ নিসাঃ ৭৬)

মিত্রের প্রয়োজনীয়তাঃ জীবনে ঠিকে থাকার জন্য, নিজেদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তথা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে মানুষ পরস্পরে মিত্রতা করে, একে অন্যের সাথে জোট বাঁধে। মানুষ অন্য ব্যক্তির সাথে, পরিবারের সাথে, গোত্রের সাথে, জাতির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নিজের শক্তি বাড়াতে চায়, শত্রুর উপর বিজয়ী হতে চায় এবং বিজয়ী থাকতে চায় তথা জীবনের তাগিদেই মানুষ তার শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ করে থাকে।

সঠিক ভাবে শত্রু মিত্র নির্ধারন করা মানব জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। তাই শত্রু মিত্র নির্ধারণের মত সূক্ষ কাজ নিপুণ ভাবে আঞ্জাম দেয়া সব সময় মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না, এ কাজে মানুষ বারবার ভুল করে ফেলে।

শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের সঠিক মূলনীতি না জানার কারণে মানুষ তার হীনস্বার্থে অন্ধ হয়ে কখনো শত্রুকে মিত্র বানায় আর কখনো মিত্রকে শত্রু ভেবে ভুল করে থাকে। ফলে অনেক সময় নীতি আদর্শের উপর অবিচল থাকাই অসম্ভব হয়ে যায়। এ পথে পা বাড়িয়ে অনেক সময় মানুষ আদর্শচ্যুত হয়ে যায়। বাস্তবে দেখা যায়ঃ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে মিত্রের প্রভাবে মানুষ পাপের পথে ধাবিত হয়, মানুষ তখন নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে, ঈমান হারা হয়ে নিজেকে ঠেলে দেয় জাহান্নামে।

মোটকথা শত্রুমিত্র নির্ধারণ মানব জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কে আপনার শত্রু আর কে মিত্র; এটা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে না পারলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই জীবনের তাগিদে মানুষকে অবশ্যই সঠিক ভাবে শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ করতে হবে, চিনে রাখতে হবেঃ কে আসল শত্রু আর কে মিত্র।

সঠিক ভাবে শত্রুমিত্র নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা ও সূত্র রয়েছে। মহান আল্লাহ্ দয়া পরশ হয়ে এসব নীতিমালা ও সূত্র আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন। আক্বাইদের পরিভাষায় এগুলোকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" তথা "শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের নীতিমালা"। তাই ঈমানের উপর অবিচল থেকে সঠিক ভাবে শত্রুমিত্র নির্ধারণ করতে হলে অবশ্যই এসব নীতিমালা ও সূত্র সম্পর্কে জানতে হবে এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হবে। আর জানতে হলে ও মানতে হলে প্রথমে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ তার শত্রু ও মিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই মানুষ নানা ভাবে এরদ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে মানুষের ঈমান আক্বীদায় এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয় সবচেয়ে মারাত্মক।
কারণঃ জীবন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে শত্রু মিত্র নির্ধারণে ভুল হলে জীবন কঠিন হয়ে যেতে পারে বা বেশী থেকে বেশী মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু আদর্শগত বা ঈমান সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে শত্রু বা মিত্র নির্ধারণে ভুল হয়ে যায় এবং এর প্রভাবে কারো ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তবে তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে।
তাই আমরা এখানে ঈমান ও আক্বীদাহগত বিষয় নিয়েই আলোচনা করব। অর্থাৎ শত্রু ও মিত্র সংক্রান্ত যে সব বিষয় সরাসরি ঈমানের সাথে সম্পর্কিত, যে সব বিষয়ে ভুল হলে সরাসরি ঈমানের উপর আঘাত আসবে, আমরা শুধু এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করব।

মিত্র পরিচিতিঃ আমরা এখানে মিত্র বলে তাকেই বুঝিয়েছি, কুরআন ও হাদীছে তথা দ্বীনি পরিভাষায় যাকে ওয়ালী (অলি) বলা হয়েছে।

ওয়ালী পরিচিতিঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল, নীতিনির্ধারক, ইত্যাদি। ওয়ালী সম্পর্কে আল-কুরআনে যেসব কথা বলা হয়েছে এর সারসংক্ষেপ হল..
১. আল্লাহ সকল মুঅমিনের ওয়ালী। (বাক্বারাহঃ ২৫৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ সকল মুঅমিনের জন্য একমাত্র কর্তৃত্বশীল নীতিনির্ধারিক।
২. আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ওয়ালী নেই। (বাক্বারাহঃ ১০৭) এর মানে হচ্ছে আল্লাহ ছারা অন্যকে কর্তৃত্বশীল বা নীতিনির্ধারিক হিসেবে মানা যাবে না।
৩. এক মুঅমিন অন্য মুঅমিনের ওয়ালী। (তাওবাহঃ ৭১) এর মানে হচ্ছে দুনিয়ার সকল মুঅমিন অন্য সকল মুঅমিনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল মিত্র।
৪. কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানানো যাবে না। (নিসাঃ ১৪৪) এর মানে হচ্ছে কোনো কাফিরকে অভিভাবক বা মিত্র বানানো যাবে না।
৫. যে সব মুসলিম আত্মীয়-স্বজন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসবে তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে গ্রহন করা যাবেনা। (তাওবাহঃ ২৩) এর মানে হচ্ছে তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না।

আমরা কাকে ওয়ালী বানাব আর কাকে বানাব না। এসম্পর্কে মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বীদার পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"। এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন।
"আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে মেনে চলার মত আইন ও বিধানের মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। শত্রু ও মিত্র নির্ধারন মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এবিষয়েও সঠিক এবং সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" তথা শত্রু ও মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ ঈমানের উপর অবিচল থাকা।
যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের টানে মানুষ একে অন্যের দায়ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয়; এমন সম্পর্ককে বলা হয় আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত আর ওই ব্যক্তিকে বলা হয় ওয়ালী। যেমন..

- পিতা সন্তানের ওয়ালী মানে অভিভাবক।
- সন্তান তার বৃদ্ধ বা মৃত বাবা-মার ওয়ালী, মানে দায়ভার বহনকারী বা দায়িত্বশীল।
- লড়াইয়ের ময়দানে একদল অন্যদলের ওয়ালী, তথা মিত্র।
- আল্লাহ্ আমাদের সকলের ওয়ালী, মানে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল।

কে ওয়ালী হবেঃ ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব এবং দায়দায়িত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, সামরিক চুক্তি, নিরাপত্তা চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী (যদি সে মুঅমিন হয়)
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা মুঅমিন হয়)
- কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ মুঅমিনের (আত্মীয় হলেও) ওয়ালী হতে পারে না।
- এমনকি বাবা-মা ভাইবোনসহ পরিবারের লোকজনও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)
- চুক্তির মাধ্যমেও ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

ওয়ালী বা মিত্র নির্ধারণের নীতিমালাঃ মহান আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র মালিক ও প্রভূ। আমাদের জীবন বিধান ও নীতিমালা নির্ধারণের তিনিই একমাত্র বৈধ অধিকারী। মিত্র নির্ধারণ আমাদের জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই অন্য সকল বিষয়ের মত এ বিষয়েও আমরা মহান প্রভুর নির্ধারিত নীতিমালা-ই মেনে চলব। কারণ আমরা তার দাস। আর দাস হিসেবে তার বিধান মেনে চলা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

মহান আল্লাহ্ আমাদের উপর সদয় হয়ে আমাদের জন্য মিত্র নির্ধারণের নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছেন। আল-কুরআনের অনেক আয়াতে এসব নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কীয় যথাযথ বর্ণনা রয়েছে। এসব নীতিমালা থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নীতি আপনাদের সামনে পেশ করা হল।

নীতিঃ ১. আল্লাহই আমাদের একমাত্র ওয়ালী, তিনি আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল আসল অভিভাবক, আসল মিত্র, আসল নীতি নির্ধারক এবং প্রকৃত আপনজন। ইরশাদ হচ্ছে..

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257)

যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের ওয়ালী হয়ে যান। তিনি তাদেরকে বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার তথা কুফর থেকে একমাত্র আলোতে তথা ইসলামে। আর যারা কুফর করে তাদের ওয়ালী হয় ত্বাগুত (ইসলাম বিদ্বেষী নেতারা) যারা তাদেরকে বের করে আনে একমাত্র আলো তথা ইসলাম থেকে হরেক রকম অন্ধকারে তথা কুফরে। তারা (ত্বাগুত ও তার অনুসারীরা) সবাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৭)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)

তুমি কি জান না? আসমানসমূহ ও যমীনের সকল কর্তৃত্ব আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো (কর্তৃত্বশীল) ওয়ালী নেই, নেই কোনো সাহায্যকারী। (২ বাক্বারাহঃ ১০৭)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহই আমাদের একক ওয়ালী, একমাত্র ওয়ালী। আমাদের সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। তাই আমরা কেবল তাদেরকেই ওয়ালী বানাবো এবং ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবো যাদেরকে ওয়ালী বানাতে বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নিতে আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দেবেন বা অনুমতি দেবেন। আমরা আল্লাহর বিধান অমান্য করে অন্য কাওকে ওয়ালী বানাবো না বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নেব না। কারণ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়ে অন্যকে ওয়ালী বানালে বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নিলে কুফর হবে।

নীতিঃ ২. যেহেতু আল্লাহই আমাদের আসল ওয়ালী এবং একমাত্র ওয়ালী। তাই যারা আল্লাহর ওয়ালী হবে কেবল তারাই আমাদের ওয়ালী হতে পারবে। অর্থাৎ আমাদের ওয়ালী হলেন আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আদর্শে অনুপ্রানিত মুঅমিনগণ। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55)

তোমাদের (উপর কর্তৃত্বশীল) ওয়ালী হলেন আল্লাহ্ এবং (অভিভাবক হিসেবে ওয়ালী হলেন) রাসূল আর (পরস্পরে দায়িত্বশীল ওয়ালী হলো) মুঅমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর তারা হয় রুকুকারী (আল্লাহর কাছে নতিস্বীকারকারী।) (৫ মা-ইদাহঃ ৫৫)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্ হলেন আমাদের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বশীল একমাত্র ওয়ালী, রাসূল সাঃ (রাসূল সা.'র অনুপস্থিতিতে তার প্রতিনিধিত্বকারী খালীফাহ) হলেন অভিভাবক হিসেবে আমাদের ওয়ালী আর মুঅমিনগণ হলেন পরস্পরে দায়িত্বশীল ওয়ালী।

নীতিঃ ৩. আমাদের মিত্র নির্ধারণের জন্য মহান প্রভু যে নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছেন এর অন্যতম হচ্ছে ঈমান, হিজরত ও জিহাদ। কোন মুসলিমকে আমরা মিত্র বানাবো আর কোন মুসলিমকে শত্রু? এটা নির্ধারিত হবে ঈমান, হিজরত ও জিহাদের ভিত্তিতে। আর এটা-ই হলো সঠিক নীতি। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দেয় এবং সাহায্য করে তারা অবশ্যই পরস্পরের ওয়ালী। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের ব্যাপারে তোমাদের (ইসলামী সরকার ও সমাজের) কোনো ওয়ালায়াত (আইনগত দায়দায়িত্ব) নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করে (ইসলামী দেশে চলে আসবে।) তবে (কাফির দেশে অবস্থান করেও) তারা যদি দ্বীনি ব্যাপারে (তথা তাদের দেশে দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে) তোমাদের কাছে (সামরিক) সাহায্য কামনা করে তবে তোমরা তাদেরকে সাহায্য করবে (এটা তোমাদের তথা ইসলামী সরকার ও সমাজের উপর ফরজ দায়িত্ব) তবে তোমাদের সাথে (শান্তি চুক্তি বা নিরাপত্তা) চুক্তি রয়েছে এমন জাতির (বিরুদ্ধে সামরিক) সাহায্য চাইলে (তোমরা সাহায্য করবে না। মনে রাখবে) আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ। (আর এর মাঝে একটি হচ্ছে চুক্তি রক্ষা করা) (৮ আনফালঃ ৭২)

আইন ও বিধানঃ এ আয়াতে ইসলামী সমাজ নীতি, যুদ্ধনীতি ও পররাষ্ট্র নীতির কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেমন..

- যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু ইসলামী দেশ ও ইসলামী সমাজের আওতায় আসেনি বরং কুফুরতান্ত্রিক দেশ ও কাফির সমাজে বসবাস করছে; তার জান মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা, অন্ন বস্ত্র চিকিৎসা, শিক্ষাসহ কোনো দায়ভার ইসলামী সরকার বহন করবে না।
- ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী দেশ ও ইসলামী সমাজের আওতায় চলে এলে তার অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তাসহ যাবতীয় দায়ভার ইসলামী সরকারকে নিতে হবে।

- কাফির দেশের অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের দেশ ও সরকারের সাথে যুদ্ধ শুরু করে সে দেশে দ্বীন কায়েমের জন্য সাহায্য চাইলে ইসলামী সরকার তাদের সাহায্য করবে। তবে ওই দেশ বা জাতির সাথে ইসলামী সরকারের শান্তি চুক্তি বা নিরাপত্তা চুক্তি থাকলে ওই দেশের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য করবে না বরং চুক্তি বলবত রাখবে। তবে ওই দেশের মুসলিমদেরকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখতেও ওই সরকারকে সাহায্য করবে না।
- ঈমান, হিজরত ও জিহাদ, এ তিন কাজের উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে কে মুসলিম জাতির শত্রু আর কে মিত্র।

নীতিঃ ৪. মিত্রতা আর আত্মীয়তা এক বিষয় নয়। আত্মীয়তা হয় জন্ম সূত্রে আর মুঅমিনের ওয়ালা বা মিত্রতা হয় দ্বীন ঈমান হিজরত ও জিহাদের ভিত্তিতে। বর্ণিত হচ্ছে..

وعن أبي عبدالله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ جِهارًا غيْرَ سِرٍّ يَقُولُ إِنَّ آلَ بَني فُلانٍ لَيسُوا بأَوْلِيائي إِنَّما وَلِيِّي اللهُ وصالحُ المُؤْمِنين ولَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّها بِبِلالِها. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، واللَّفْظُ للبُخاري.

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স্ব রা. বলেন আমি শোনেছি, রাসূল সাঃ নিম্নস্বরে নয় বরং উচ্চস্বরে বলেছেনঃ অমুক পরিবার আমার ওয়ালী (মিত্র বা আপন) নয়। আমার ওয়ালী হলেন আল্লাহ্ আর সৎকর্মশীল মুঅমিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তা আছে, তাদের গায়ের পানির ছিটা আমার গায়েও লাগে (মানে তাদের কষ্টে আমিও কষ্ট পাই) (বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলো বুখারীর)

নীতিঃ ৫. আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে কাউকে ওয়ালী বা মিত্র বানানো মারাত্মক ধরণের অন্যায়, পাপ এবং আদর্শিক বিচ্যুতি। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে আর সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9)

এরা কি (কর্তৃত্বশীল) ওয়ালী হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মেনে নিয়েছে? আসলে আল্লাহই একমাত্র ওয়ালী, তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (৪২ শূরাঃ ৯)

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14)

(হে নবী! তাদেরকে) জিজ্ঞেস করঃ আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে (কর্তৃত্বশীল) ওয়ালী বানাবো? অথচ তিনিই আসমানসমূহ এবং যমীনের একমাত্র উদ্ভাবক। তিনি সকলের অন্ন যোগান, তার অন্ন কাউকে যোগাতে হয় না। বলে দাওঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমিই হই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। (আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে অন্যকে কর্তৃত্বশীল ওয়ালী বানালে শিরক হয়) আর (এমন কাজ করে) তুমি মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যেও না। (৬ আনয়া'মঃ ১৪)

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের উপর একমাত্র কর্তৃত্বশীল ওয়ালী হলেন আল্লাহ্ তায়া'লা। আল্লাহর কর্তৃত্বে শারীক করে অন্যকে এমন ওয়ালী হিসেবে মেনে নিলে শিরক হয়, আর এটাকে বলা হয় কর্তৃত্বে শিরক। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119)

(মুশরিকদের অধিকাংশ দেবীই নারী মূর্তি। আর মূর্তি সংস্কৃতির রূপকার হচ্ছে শয়তান। এদিকে ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) তারা আল্লাহকে ছেড়ে কিছু নারী(মূর্তি)র উপাসনা করে, উপাসনা করে বিদ্রোহী শয়তানের। আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) লা'নত করেছেন, সে বলেছেঃ (হে রাব্ব!) আমি আপনার অনেক বান্দাকে (আমার পথে) নিয়ে আসব, আমি (শয়তান) তাদের বিভ্রান্ত করব, আশা দেব, আদেশ করব, (আমার হুকুমে) তারা পশুর কর্নচ্ছেদন করবে। আমি আদেশ করবঃ আমার আদেশে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেবে। সুতরাং (হে মানুষ! মনে রেখো!) যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে ওয়ালী (মিত্র) বানাল সে চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল। (৪ নিসাঃ ১১৭-১১৯)

শত্রু নির্ধারণের নীতিমালাঃ সঠিক ভাবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই শত্রু ও মিত্র চিহ্নিত করতে হবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে শত্রু চিহ্নিত করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ শুধু বাহ্যিক বিবেচনায় মানুষকে সঠিক ভাবে বিচার করা যায় না। আর মানুষের অন্তরের ব্যাপারে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। তবে মহান আল্লাহ্ হলেন অন্তর্যামী। তিনি মানুষের অন্তরের ব্যাপারেও অবগত। শুধু তিনিই জানেন কে আমাদের আসল শত্রু আর কে আমাদের আসল মিত্র। তাই এসব ব্যাপারে আমাদেরকে মহান আল্লাহর নীতিমালার উপর নির্ভর করতে হবে।

নীতিঃ ৬. শত্রু নির্ধারণে আমাদেরকে আল্লাহর বিধানের উপর নির্ভর করতে হবে। তবেই কেবল সঠিক ভাবে শত্রু নির্ধারণ করা আমাদের জন্য সম্ভব হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا (45)

তোমাদের শত্রুদের ব্যাপারে আল্লাহ্ খুব অবগত। ওয়ালী (কর্তৃত্বশীল ও নীতিনির্ধারক) হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট আর সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট। (৪ নিসাঃ ৪৫)

নীতিঃ ৭. শয়তান আমাদের আসল শত্রু, সুস্পষ্ট দুশমন। তাই শয়তানের দুসররাও আমাদের আসল শত্রু, সুস্পষ্ট দুশমন। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। (বাস্তব জীবনের কিছু ব্যাপারে ইসলাম আর কিছু ব্যাপারে অন্যকিছু পালন করে) শয়তানের পদাংক অনুকরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২ বাক্বারাহঃ ২০৮)

পর্যালোচনাঃ শয়তান শুধু ইবলিসই নয়। বরং যে বা যারা অন্যদেরকে কুপথে ডাকে এবং কুমন্ত্রণা দেয় তারা সকলেই শয়তান। শয়তান হচ্ছে সকল মন্দের মূল হোতা। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)

বলো! আমি সুরক্ষা চাই মানুষের প্রভুর কাছে, মানুষের মালিকের কাছে, মানুষের ইলাহের কাছে, খান্নাসের (শয়তানের) কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, (হোক সে) জিন্ন অথবা মানুষ। (১১৪ সূরাহঃ নাস)

সুতরাং আমাদের সমাজের যে বা যারা মানুষকে কুপথে ডাকে, কুমন্ত্রণা দেয় আর পাপের পথে পরিচালিত করে তারাও শয়তান। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14)

যখন মুঅমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন এরা বলে "আমরাও মুঅমিন"। আর যখন তাদের শয়তানদের (নেতাদের) সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করে তখন বলে "আমরা তোমাদেরই সঙ্গী" (ঈমানের কথা বলে) আমরা তাদের সাথে উপহাস করছি মাত্র। (২ বাক্বারাহঃ ১৪)

নীতিঃ ৮. দানব শয়তান হোক বা মানব শয়তান, সকল শয়তানই আমাদের শত্রু। কোনো শয়তানকেই ওয়ালী তথা মিত্র হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112)

(মক্কার কাফিররা যে ভাবে তোমার সাথে দুশমনি করছে) ঠিক সে ভাবেই প্রত্যেক নবীর দুশমন হিসেবে আমি মানুষ ও জিন্ন শয়তানদের লাগিয়ে দিয়েছি। শয়তানরা একে অপরকে প্রতারণামূলক সাজানো কথা শিখিয়ে দেয়। তোমার প্রভু চাইলে তারা এমন করতে পারত না (কিন্তু এটাই প্রভূর ইচ্ছা। তাই) তাদেরকে ও তাদের মিথ্যাচারকে উপেক্ষা করে চলো। (৬ আনয়া'মঃ ১১২)

নীতিঃ ৯. শয়তানদেরকে ওয়ালী বানানো বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। তাই যে বা যারা কোনো শয়তানকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক, নীতিনির্ধারক) বানিয়ে নেয় বা মেনে নেয় তারা আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30)

(আল্লাহর বিধান জানার পর মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়) একদল হেদায়াত পায় আর একদলের উপর অবধারিত হয় বিভ্রান্তি। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে ওয়ালী বানিয়ে নেয় /ওয়ালী হিসেবে মেনে নেয় এবং তথাপিও মনে করে তারা সঠিক পথেই আছে। (৭ আ'রাফঃ ৩০)

নীতিঃ ১০. আমরা আল্লাহর দাস আর আল্লাহ্ আমাদের একমাত্র মালিক। তাই আল্লাহর শত্রুই আমাদের শত্রু। যে মুসলিম আল্লাহর শত্রুকে মিত্র বানায় বা মিত্র হিসেবে মেনে নেয় সে বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় (সামরিক) শক্তি সঞ্চয় কর, তৈরি রাখো ঘোড়ার বহর যার দ্বারা সন্ত্রস্ত করে রাখবে আল্লাহর শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে। (তোমরা যে সব শত্রুর মোকাবিলা করছ, এ ছাড়াও) তোমাদের আরো অনেক শত্রু আছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমরা আল্লাহর পথে (প্রতিরক্ষা, সামরিকসহ অন্যান্য খাতে খরচ করবে। কারণ তোমরা আল্লাহর পথে) যা খরচ করবে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে, তোমাদের উপর সামান্যতম অবিচার করা হবে না। (৮ আনফালঃ ৬০)

নীতিঃ ১১. শুধু কাফিরই নয় বরং মুনাফিকরাও আমাদের শত্রু। তাইতো তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (4)

তুমি দেখবেঃ এরা বেশভুষায় (দাড়ী, টুপী, জামা, বুরকা, নিকাব, ইত্যাদিতে) তোমাকে বিমোহিত করে ফেলবে। এরা কথা বললে (এদের বাচন ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়ে) তুমি আগ্রহ করে শুনবে। আসলে এরা হচ্ছে দেয়ালে ঠেক লাগানো কাঠের মত (দেখতে সুন্দর কিন্তু শিকড়বিহীন) প্রতিটি শব্দকেই এরা এদের বিরুদ্ধে (কোনো পদক্ষেপ হিসেবে) মনে করে। এরাই আসল শত্রু সুতরাং তাদেরকে উপেক্ষা কর। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুক, এরা কোথায় চলে যাচ্ছে? (৬৩ মুনাফিকূনঃ ৪)

নীতিঃ ১২. যে বা যারা দ্বীনের পথে বা দ্বীনি কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে, দ্বীনি কাজ থেকে লোকজনকে ফিরিয়ে রাখতে চায় এরাও আমাদের শত্রু, যদিও এরা আমাদের আত্মীয় বা বন্ধু হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তানগণ তোমাদের শত্রু (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ ও হিজরত থেকে এবং দ্বীনি কাজ থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে) তাই তাদের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থেকবে। তোমরা যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, ক্ষমা কর, মার্জনা কর (তবে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।
(৬৪ তাগাবুনঃ ১৪)

নীতিঃ ১৩. যে বা যারা তথা যে সব মুসলিম ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করবে তাদেরকে ওয়ালী বানানো নিষিদ্ধ। কারণ তারাও আমাদের শত্রু, যদিও তারা আমাদের আত্মীয় বা বন্ধু হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তবে তাদেরকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে বা যারা তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে তারা অপরাধী হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

নীতিঃ ১৪. যারা দ্বীনের শত্রু, যারা আল্লাহর শত্রু; তারা আমাদেরও শত্রু। যে মুসলিম আল্লাহর কোনো শত্রুকে মিত্র বানাবে সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) আমার ও তোমাদের শত্রুকে ওয়ালী (মিত্র) বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমরা তাদের সাথে হৃদ্যতা চাও অথচ তারা তোমাদের কাছে আগত সত্যকে (কুরআনকে) প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ বলে তারা তোমাদেরকে এবং রাসূলকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। তোমরা যদি আমার (আল্লাহর) সন্তুষ্টির জন্য আমার পথে জিহাদে বের হয়ে থাক তবে (উল্লেখিত নীতি মেনে চলবে) তোমরা গোপনে তাদের সাথে হৃদ্যতা করতে চাও, অথচ আমি গোপন প্রকাশ্য সব জানি। তোমাদের যে এমন করবে সে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।
(মনে রেখো!) ক্ষমতা পেলে তারা তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে, তাদের হাত ও মুখ প্রসারিত (পেশীশক্তি ও মিডিয়া ব্যবহার) করে তোমাদের ক্ষতি করবে। তারা চায়ঃ তোমরা কুফর কর। (মনে রেখো!) কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজন, সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। (সেদিন) তিনি সবাইকে আলাদা করে দেবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সব প্রত্যক্ষ করেন। (৬০ মুমতাহিনাহঃ ১-৩)

নীতিঃ ১৫. শত্রুতা ও মিত্রতার মূল মানদণ্ড হচ্ছে কুফর ও ঈমান। মানুষের শত্রু ও মিত্র নির্ধারিত হবে কুফর ও ঈমানের ভিত্তিতেই। মুঅমিন মুঅমিনের মিত্র আর কাফির মুশরিক একে অপরের মিত্র। মুনাফিকরা বাহ্যত মুসলিম হলেও আসলে কাফির, তাই মুনাফিকরাও কাফিরদের মিত্র। এটা-ই আসল কথা, শত্রু মিত্র নির্ধারণের এটা-ই সঠিক নীতি। এমন শত্রুতা হলো আদর্শিক শত্রুতা এবং এমন মিত্রতা হলো আদর্শিক মিত্রতা। আর এটা-ই শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের মূল সূত্র বা আসল বিষয়।
কাফিরদের সাথে মুঅমিনের সম্পর্ক হবে খুবই সীমিত এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানার আওতাধীন থেকে। যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়া'লা এবং তদীয় রাসূল সা.। যে বা যারা এ সীমানা লঙ্ঘন করবে তাদের তরে কঠিন আযাব। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)

মুঅমিনরা যেন মুঅমিন ছাড়া কোনো কাফিরকে ওয়ালী (মিত্র) না বানায়। কেউ এমন করলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। তবে প্রতিরক্ষা হিসেবে তাক্বিয়্যাহ করতে পারবে। (আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে তাক্বিয়্যাহ বলে) আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (আযাবের) ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। আর (মনে রেখো! তোমাদের সবাইকে) আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২৮)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ আ'যীমাত ও রুখসাত

বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মানতে গিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়তে হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে কখনো কখনো দ্বীনি বিধান পালন করা কঠিন হয়ে যায়। তখন আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগী, বুঝে উঠতে পারি না কি করব, কোন পথে যাব?

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। সকল যুগের সকল স্থানের সকল মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মুলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। মানুষের এমন অবস্থার কথা বিবেচনা করে ইসলামী বিধান পালনের জন্য দুটি পথ খোলা রেখেছে ইসলামী শারীয়া'হ। অর্থাৎ ইসলামী বিধান পালনের পদ্ধতি দুইটিঃ আ'যীমাত ও রুখসাত। এবার আসুন! আ'যীমাত ও রুখসাত সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

আ'যীমাতঃ আ'যীমাত অর্থ দৃঢ় থাকা, অবিচল থাকা। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকার নাম আ'যীমাত।

রুখসাতঃ রুখসাত অর্থ অনুমোদন, সুযোগ। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়ে জীবন বাঁচানোর সুযোগ গ্রহণ করার নাম রুখসাত।

বিধানঃ ইসলামী বিধানে আ'যীমাত ও রুখসাত দুই পদ্ধতিই অনুমোদিত। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান বা ইসলামী বিধানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকা মোটেই নির্বুদ্ধিতা বা নিন্দনীয় নয় বরং এটা ইসলামের আ'যীমাত পদ্ধতি।

আ'যীমাতের উপর অবিচল থাকলে প্রতিদান পাওয়া যায়। এ পথে কষ্ট সহ্য করলে মহান আল্লাহ উপযুক্ত বিনিময় দান করেন বরং আরো বাড়িয়ে দেন। এ অবস্থায় মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায়। শহীদকে ৫টি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

পক্ষান্তরে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে (অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে) শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিলেও পাপ হয় না বা ঈমানের ক্ষতি হয় না। এটা হচ্ছে ইসলামী বিধানের রুখসাত পদ্ধতি। রুখসাত পদ্ধতিও ইসলামে অনুমোদিত এবং এর মান মর্যাদাও কম নয়।

উপমাঃ আ'যীমাত ও রুখসাতের নমুনা সাহাবাদের থেকেই পাওয়া যায়। আ'যীমাতের জ্বলন্ত নমুনা খুবাইব রাঃ

পরিচিতিঃ তিনি খুবাইব বিন আ'দী বিন মালিক বিন আ'মির আল-আ'উসী আল-আনসারী রাঃ। তিনি স্থির স্বভাবের ও দৃঢ় মনা মানুষ ছিলেন এবং খ্যাতনামা বীর ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুশমনের আতঙ্ক। তিনি প্রথম দিকেই মুসলমান হয়ে ছিলেন এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করে ছিলেন।

বদর যুদ্ধে তিনি মক্কার নেতা হারিছ বিন আ'মির বিন নুফাইলকে হত্যা করে ছিলেন। এজন্য মক্কার নেতারা ব্যক্তিগত ভাবে তার দুশমন হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিশোধের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বর্ণিত আছে..

৪র্থ হিজরির সফর মাসে আরবের দুটি গোত্র মদিনায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদেরকে ইসলামী বিধান ও ক্বুরআন শিক্ষা দেবার জন্য কিছু শিক্ষক পাঠানোর অনুরোধ করল। রাসূল সাঃ ১০সদস্যের একটি শিক্ষক দল পাঠালেন। যাদের নেতা ছিলেন আ'স্বিম বিন ছাবিত আল-আনসারী রাঃ। খুবাইব রা. ও এইদলে শামিল ছিলেন।

হুযাইলের এলাকা অতিক্রম কালে বনু-লিহয়ানের প্রায় দুইশত তিরান্দাজ তাদের গতিরোধ করে এবং আত্মসমর্পণের আহবান জানায়। তারা ওয়াদা করে; আত্মসমর্পণ করলে কাউকে হত্যা করা হবে না।

মুসলিম দলনেতা আ'স্বিম বিন ছাবিত বললেনঃ কোনো কাফিরের কথায় আস্বস্থ হয়ে আত্মসমর্পণে আমি রাজি নই। তিনি তীর চালিয়ে লড়াই শুরু করে দিলেন এবং তিনিসহ সাতজন সাহাবী লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। বাকি তিনজন কাফিরদের কথা বিশ্বাস করে হাতিয়ার ছেড়ে দিলেন। খুবাইব রাঃ ছিলেন ওই তিনজনের একজন।

একটু পর তাদের বেঁধে ফেলা হল। এক সাহাবী বললেনঃ এটা হচ্ছে প্রতারণার প্রথম ধাপ। তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। ফলে বেইমানরা তাকে মেরে ফেলল। খুবাইব রাঃ ও তার সঙ্গীকে মক্কা এনে বিক্রি করা হল। হারিছ বিন আ'মির পরিবার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে খুবাইব রাঃকে কিনে নিল।

হারিছের এক মেয়ে বলেনঃ খুবাইব যখন বন্দি। একদা আমার এক শিশু ছেলে চাকু নিয়ে খুবাইবের কাছে চলে গেল। হঠাৎ দেখি খুবাইবের হাতে চাকু। আমার ছেলে তার পায়ের উপর বসা। আমি আঁতকে উঠলাম। খুবাইব বলঃ ভাবছ আমি তোমার ছেলেকে হত্যা করব? না! আমি এমন করব না। হারিছের মেয়ে বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা খুবাইবের মত ভালো বন্দি কোনো দিন দেখিনি।

মক্কার হারামের বাইরে তানঈ'ম নামক স্থানে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে খুবাইব রাঃকে নিয়ে আসা হল। তিনি দুই রাকায়াত সালাত আদায়ের সুযোগ চাইলেন। মুশরিকরা সুযোগ দিল। খুবাইব রাঃ দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং বললেনঃ মন চাইছিল সালাতটাকে আরো দীর্ঘায়িত করি কিন্তু করিনি। কারণ তোমরা ভাববেঃ সালাতকে বাহানা বানিয়ে মরণের ভয়ে কালক্ষেপণ করছি।

খুবাইব রাঃ তখন ফাঁসির মঞ্চে। কাফিররা বলঃ খুবাইব! তোমার জায়গায় মুহাম্মাদ হলে আজ কেমন হত? (তুমি শুধু প্রতিকী ভাবে রাজি হয়ে যাও) হয়ত তোমাকে ছেড়ে দেব।

খুবাইব বললেনঃ আমি বেঁচে যাব আর মুহাম্মাদ সাঃর গায়ে কাটা ফুটবে তাও আমি মেনে নেব না।

আবু-সুফিয়ান বলঃ মুহাম্মাদের প্রতি তার সঙ্গীদের ভালোবাসা নজিরবিহীন। তারা খুবাইব রাঃকে ফাঁসি দিল। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (ঘটনাটি বুখারীসহ অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে)

খুবাইব রাঃর এ কাজ ছিল আ'যীমাত। আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে তিনি জীবন দিয়েছেন। এ ছাড়াও ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়্যাহ রাঃ, সুমাইয়্যাহর স্বামী ইয়াসার এবং ইমাম আহমাদ রাহিঃসহ আরো অনেকেই আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে জীবন দিয়েছেন। ইমাম আবু-হানীফাহ, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহসহ আরো অনেকেই আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে মার খেয়েছেন, জেলে গিয়েছেন, সহ্য করেছেন অমানবিক অত্যাচার। এছাড়াও যুগে যুগে আরো কত উলামা ও মুসলিমগণ আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন, জীবন দিয়েছেন, শাহাদাতের মর্যাদায় ধন্য হয়েছেন।

রুখসাতের নমুনাঃ রুখাসাতের জ্বলন্ত নমুনা আ'ম্মার বিন ইয়াসার রাঃ।

পরিচিতিঃ আম্মার বিন ইয়াসার রাঃর মা সুমাইয়্যাহ ছিলেন দাসী। বাপ ইয়াসার মক্কার স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন না। ইয়াসার মক্কায় বনী-মাখজুমের আশ্রয়ে থেকে তাদের দাসী সুমাইয়্যাহকে বিয়ে করে ছিলেন।

ইয়াসার পরিবার শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন এবং এজন্য তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। শুধু ইসলাম গ্রহণের কারণে সুমাইয়্যাহ রা.কে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুমাইয়্যাহ রাঃ ইসলামের প্রথম শহীদ। সুমাইয়্যাহর পর তার স্বামী ইয়াসারকেও অমানবিক অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে-ই আ'যীমতের উপর অবিচল থেকে শহীদ হয়েছেন।

আ'ম্মারের উপরও অবর্ননীয় অত্যাচার করা হয়েছে। এক পর্যায়ে আত্মরক্ষার্থে বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়েছেন আ'ম্মার রা.। ফলে কাফিররা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আ'ম্মার বিষয়টি নিয়ে খুব ভাবনায় ছিলেন।

একদা তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অসহ্য হয়ে তাদের কথা মেনে নিয়েছি। রাসূল সাঃ বললেন তোমার অন্তর কি ঈমানের উপর অবিচল ছিল না? তিনি বললেনঃ জী, আমার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ তবে কিছুই হবে না। তারা বারবার করলেও কিছু হবে না। এ বিষয়ে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)

যে ব্যক্তি ঈমানের পর কুফর করল (সে কাফির হয়ে গেল) তবে (কুফর করতে) বাধ্য করা হলে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকলে (কাফির হবে না।) যে স্বেচ্ছায় কুফর করবে তার উপর আল্লাহর গযব, তার তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (১৬ নাহলঃ ১০৬)
আম্মার রাঃর এ কাজটি ছিল রুখসাত। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি রুখসাতের উপর আমল করে ছিলেন। এমন করা দুষের নয়।

বিঃ দ্রঃ= আক্বাইদের পরিভাষায় যাহা "আ'যীমাত ও রুখসাত", ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "ইকরাহ"। ইকরাহ অর্থ বাধ্য করা, জবরদস্তী করা, হুমকি দেয়া। হানাফী ফিক্বহের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব "মুখতাসার আল-ক্বুদূরী" যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের মাদরাসাহ সমূহে পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হয়। এ কিতাবের "ইকরাহ" অধ্যায় থেকে কিছু বিধান নিম্নে পেশ করা হলঃ

- হুমকিদাতা সরকার হোক বা সন্ত্রাসী, তার যদি এ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকে তবে আইনগত ভাবে এটা "ইকরাহ" হিসেবে গণ্য হবে।
- কাউকে যদি কুফর করতে বা নবীকে গালি দিতে বাধ্য করা হয়। নতুবা প্রহার বা জেলের হুমকি দেয়া হয় তবে এটা আইনগত ভাবে "ইকরাহ" হিসেবে গণ্য হবে না। (অর্থাৎ জেল বা প্রহারের ভয়ে কুফর করা বা নবীকে গালি দেয়া বৈধ হবে না)
- যদি কুফর না করলে বা নবীকে গালি না দিলে মেরে ফেলার বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয়, তবে এটা আইনগত "ইকরাহ" হিসেবে গণ্য হবে এবং এ হুমকি আমলে নিয়ে অন্তরে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে শুধু মুখে হুমকি দাতার কথা মেনে নিলে পাপ হবে না।
- হুমকি দাতার কথা না মেনে (আ'যীমাতের উপর) মারা গেলে বা অত্যাচারিত হলে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে।
- কাউকে যদি হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণে (অথবা হারাম কাজ করতে) বাধ্য করা হয় এবং এটা না করলে জেল বা প্রহারের হুমকি দেয়া হয় তবে (জেল বা প্রহারের ভয়ে) এমন কাজ করা বৈধ হবে না।
- হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণ না করলে যদি মেরে ফেলার বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয় তবে এটা মেনে নিতে হবে। অন্যতায় (হুমকি দাতার কথা না মেনে ক্ষতিগ্রস্থ হলে) পাপ হবে।
- সরকার (পুলিশ, আর্মি) যদি কাউকে যিনা করতে বাধ্য করে তবে তাকে (পাপী হিসেবে) সাজা দেয়া হবে না।
- আর সরকার ছাড়া অন্য কেউ যিনা করতে বাধ্য করলে ইমাম আবু-হানীফার মতে সাজা দেয়া হবে। তবে ইমাম আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিঃর মতে সাজা দেয়া হবে না। (সে নিরপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ফতোয়া এর উপরই)
- কাউকে বাধ্য করে মুরাতাদ বানালে তার স্ত্রীর সাথে বিয়ে ভঙ্গ হবে না। (অর্থাৎ তার উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হবে না)
- অন্য মানুষকে হত্যা করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে (জীবন গেলেও) এটা মানা (হত্যা করা) যাবে না। আর করে ফেললে পাপী হিসেবে গণ্য হবে। তবে বাধ্যকারীও অপরাধী হিসেবে সাজা ভোগ করবে।
- বিবাহ করতে বা তালাক দিতে কাউকে বাধ্য করা হলে এবং বাধ্য হয়ে বা ভয়ে কাজটি করে ফেললে এটা হয়ে যাবে।
- কাউকে কিছু বেচতে বা কিনতে বাধ্য করা হলে (মুক্ত হবার পর এ ক্রয়-বিক্রয় বলবত রাখা বা না রাখার ব্যাপারে) তার এখতিয়ার থাকবে। (উল্লেখিত সকল বিধানই ক্বুদুরী থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে ধারা বর্ণনায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে)

নীতিঃ ১৬. কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানানো নিষিদ্ধ। যে মুসলিম কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানাবে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139)

মুনাফিকদের সংবাদ দাও; তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যারা মুঅমিনদের বদলে কাফিরদেরকে ওয়ালী (মিত্র) বানায়। তারা কি এদের কাছে ইজ্জত চায়? আসলে সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (৪ নিসাঃ ১৩৮-১৩৯)
ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিনদের ছেড়ে কাফিরদের ওয়ালী বানানো কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। মুনাফিকের জানাযা পড়তে এবং তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

নীতিঃ ১৭. যে বা যারা দ্বীন নিয়ে হাসি তামাশা করে তাদেরকে ওয়ালী বানানো নিষেধ। যে মুসলিম এমন কাউকে ওয়ালী বানাল সে সরাসরি আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শুনো!) তোমরা এমন কাউকে ওয়ালী বানিও না যারা তোমাদের দ্বীন নিয়ে হাসিতামাশা করে হোক সে আহলে কিতাবের কেউ অথবা কোনো কাফির। (কারণ এসব হচ্ছে তাক্বওয়া পরিপন্থী কাজ) আর তোমরা যদি মুঅমিন হতে চাও তবে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর। (দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করা কুফর) (৫ মা-ইদাহঃ ৫৭)

নীতিঃ ১৮. বাস্তব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে ঈমান ও ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করাও কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তথা ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করলে (সে আত্মীয় হলেও) তাকে ওয়ালী বানানো যাবে না। যে মুসলিম এমন কাউকে ওয়ালী বানাবে সে পাপিষ্ঠ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শুনো!) তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করলে তোমরা তাদেরকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে কেও তাদেরকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) হিসেবে মেনে নেবে সে অপরাধী হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

কয়েকটি উদাহরণ..

উদাহরণঃ ১. নূহ আ. সাড়ে ৯ শত বছর দ্বীনের দাওয়াত দিলেন কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই তার দাওয়াত অগ্রাহ্য করেছে, তারা তাকে বর্জন করেছে, অবজ্ঞা করেছে, দম্ভ করেছে এবং তাদের এ অবজ্ঞা

আর দম্ভ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এক পর্যায়ে নূহ আ. জাতির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করলেন। বিষয়টির বর্ণনা দিয়ে নাযিল হয়েছে..

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9)

নূহ বললঃ হে রাব্ব! আমি আমার জাতিকে রাতদিন দাওয়াত দিয়েছি কিন্তু আমার এ দাওয়াত তাদের পলায়নই কেবল বৃদ্ধি করেছে। তারা যেন তোমার মাগফিরাত পেতে পারে এ লক্ষ্যে আমি যখনই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি; তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে (যাতে আমার কথা কানে না যায়) কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিয়েছে (যেন আমি তাদের চিনতে না পারি) তারা বারবার এমন করছে। তারা চরম অহমিকায় মেতে রয়েছে। আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে (উন্মুক্ত) দাওয়াত দিয়েছি, প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, গোপনে দাওয়াত দিয়েছি (কিন্তু কোনো দাওয়াতেই কাজ হয়নি) (৭১ নূহঃ ৫-৯)

নূহ আ. এক পর্যায়ে জাতিকে আযাবের ভয় দেখালেন এতে তারা আরো ক্ষেপে গেল। জাতীয় নেতারা ক্ষেপে গিয়ে নূহ আঃকে চ্যালেঞ্জ করে বসলো। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33)

তারা (জাতীয় নেতারা) বললঃ নূহ! তুমি অনেক বিবাদ করে ফেলছ। (আমরা তোমার এসব তর্ক/বিবাদ আর সহ্য করব না) তুমি সত্য হলে (আযাবের ব্যাপারে) তোমার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে দেখাও (অর্থাৎ নূহ আ.'র দাওয়াতকে তারা কুতর্ক এবং বিবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করল।) নূহ বললঃ (এ ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই) আল্লাহ যদি চান তবে অবশ্যই আযাব আসবে, তখন তোমরা এটা ফিরাতে পারবে না। (১১ হূদঃ ৩২-৩৩)

এমন পরিস্থিতিতেও আম জনতা পাপিষ্ঠ নেতাদের আনুগত্য অব্যাহত রাখল। তাই নূহ আ. তাদের ব্যাপারেও অভিযোগ করলেন। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23)

নূহ বললঃ হে রাব্ব! তারা (আম জনতা) আমার অবাধ্য হয়েছে এবং এমন লোকদের আনুগত্য করছে যাদের সন্তান ও সম্পদ তাদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে, তারা বারবার চক্রান্ত করছে, ষড়যন্ত্র করছে, (নেতারা জনতাকে) বলছেঃ তোমরা তোমাদের খোদাদেরকে ছেড়ে যেও না। ওয়াদ, সুয়া'দ, ইয়াগূছ, ইয়াউ'ক্ব ও নাসরকে ছেড়ে যেও না। (এসব তাদের মনগড়া খোদার নাম) (৭১ নূহঃ ২১-২৩)

পরিশেষে আল্লাহ্ তায়া'লা নূহ আ.কে জানিয়ে দিয়েছেনঃ তোমার উম্মতের আর কেউ ঈমান আনবে না। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)

নূহের কাছে ওহী পাঠানো হলঃ তোমার জাতির যারা এ পর্যন্ত যারা ঈমান এনেছে এরা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের এসব কাজকর্মের ব্যাপারে তুমি দুঃখ করো না। (১১ হূদঃ ৩৬)

নূহ আ. ভাবলেনঃ কেউ যখন ঈমান আনবেই না তবে এদের দিয়ে আর কি হবে? তিনিও পরিষ্কার ভাষায় তাদের ধ্বংসের জন্য বদ-দোয়া করলেন। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا(27)

নূহ বললঃ হে রাব্ব! এ পৃথিবীতে কাফিরদের একটি ঘরও অবশিষ্ট রেখো না। তাদের বাঁচিয়ে রাখলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে, পাপিষ্ঠ কাফির ব্যতীত (কোনো ভালো) সন্তানও এরা জন্ম দেবে না। (৭১ নূহঃ ২৬-২৭)

আল্লাহ্ নূহ আঃর দোয়া কবুল করলেন। তিনি জানিয়ে দিলেনঃ তোমার জাতির উপর আযাব আসন্ন। আর এ আযাব হলো বন্যা। নূহ আঃকে আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ বললেন..

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37)

তুমি একটি জাহাজ তৈরি কর আমাদের তত্বাবধানে, আমাদের নির্দেশ মত। আর (শুনো!) ওই পাপিষ্ঠদের (ক্ষমার) ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে যেও না, অবশ্যই তাদের ডুবিয়ে মারা হবে (আর এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।) (১১ হূদঃ ৩৭)

নূহ আঃ জাহাজ বানানো শুরু করে দিলেন। আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেনঃ আযাব আসন্ন এবং এ আযাবে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহর আযাব থেকে শুধু তারাই রক্ষা পাবে যারা তোমার সঙ্গে জাহাজে আরোহণ করবে। আযাব

শুরুর আলামত হিসেবে নূহ আঃকে জানিয়ে দেয়া হলঃ যখন চুলার ভিতর থেকে পানি উথলে উঠবে তখন মনে করবে আযাব শুরু হয়ে গেছে। তখন তুমি প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করে জাহাজে উঠতে দেবে, তোমার আহল এবং তোমার সঙ্গী মুঅমিনদেরকে জাহাজে তুলে নেবে। ইরশাদ হচ্ছে..

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40)

যখন চলে এল আযাব, উথলে উঠল চুলা (শুরু হল বন্যা।) আমি বললামঃ (তুমি জাহাজে আরোহণ কর এবং) প্রত্যেক প্রজাতি থেকে এক এক জোড়া (পশু পাখি,) তোমার আহল (অনুসারী/পরিবারকেও জাহাজে তুলে নেবে) তবে (তোমার পরিবারের) যার ব্যাপারে (আযাবের) সিদ্ধান্ত হয়েগেছে সে (তোমার স্ত্রী ও এক ছেলে) ছাড়া। আর যারা তোমার উপর ঈমান এনেছে (এদেরকে জাহাজে তুলে নাও।) খুব অল্প লোকই তার উপর ঈমান এনেছিল। (১১ হূদঃ ৪০)

নূহ আঃ তাই করলেন। আযাব এসে গেল, শুরু হল বন্যা। নূহ আঃ জাহাজে চড়ে ভেসে চললেন। বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল সব, ভেসে যাচ্ছিল নূহ আঃর কাফির ছেলে কিনয়া'ন। ছেলেকে ডুবতে দেখে নূহ আঃর দয়া হল, তিনি ছেলেকে kকাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে আসার আহ্বান করলেন। ঘটনাটির বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে..

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43)

জাহাজটি তাদের নিয়ে পাহাড়সম ঢেউয়ের মাঝে ভেসে চলল। ছেলেকে বিচ্ছিন্ন (ভাবে ডুবতে) দেখে নূহ ডেকে বললঃ বৎস! কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলে আসো। ছেলে বললঃ পাহাড়ে চলে যাচ্ছি, পাহাড় পানি থেকে বাঁচাবে। নূহ বললঃ এ আযাব থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া। এমন সময় ঢেউ এসে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিল। ছেলে ডুবে গেল। (১১ হূদঃ ৪২-৪৩)

ছেলেকে এমন ভাবে ধ্বংস হতে দেখে নূহ আঃর মন কেঁদে উঠল, এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45)

নূহ ডেকে বললঃ হে রাব্ব! ছেলে আমার "আহল" (তথা পরিবার ভুক্ত। আর তুমি আমার আহলকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছো। সুতরাং তুমি তাকে রক্ষা কর) নিশ্চয় তোমার ওয়াদা সত্য। আর তুমি হলে সকল ক্ষমতার উৎস। (১১ হূদঃ ৪৫)

কাফির পুত্রের প্রতি নবীর এমন মমতা দেখে মহান আল্লাহ্ নূহ আঃকে ধমক দিলেনঃ

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46)

আল্লাহ বললেনঃ নূহ! সে তোমার "আহল" (অনুসারী) নয়। তার কাজকর্ম সঠিক নয়। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছিঃ আমার কাছে এমন কিছু চেও না যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই। নতুবা তুমিও মুর্খদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। (১১ হূদঃ ৪৬)

নূহ আ. নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি ক্ষমা চাইলেন। তার ক্ষমা চাওয়ার কথা উল্লেখ করে ইরশাদ হচ্ছে.

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ (47)

নূহ বললঃ হে রাব্ব! যে ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই এমন কিছু চাওয়া থেকে তোমার কাছে সুরক্ষা কামনা করছি। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। (১১ হূদঃ ৪৭)

আইন ও বিধানঃ নৈতিক ও আদর্শিক বিচারে রক্ত সম্পর্কের চেয়ে দ্বীনের সম্পর্ক বেশী মজবুত। তাইতো দ্বীনহীন ছেলে মুসলিম পিতার উত্তরাধিকার হতে পারে না, মুসলিম ছেলের উত্তরাধিকারী হয় না দ্বীনহীন বাবা-মা। আর এজন্যই দ্বীনহীন বাবা-মা বা ছেলেমেয়েকে ওয়ালী বানালে পাপ হয়।

উদাহরণ পর্যালোচনাঃ ছেলে কাফির হবার কারণে নবী হয়েও নূহ আঃ আপন ছেলেকে উদ্ধার করতে পারলেন না, এমনকি ছেলেকে বাঁচানোর আবেদন করেও ধমক খেলেন। কারণঃ রক্ত সম্পর্কে আপন হলেও কোনো কাফির কখনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না।

উদাহরণঃ ২. আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাঃকেও নিজের আত্মীয়স্বজন ও গোত্রের বিরুদ্ধে কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তিনিও তাদের জন্য বদদোয়া করেছেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আপন চাচা আব্বাস, চাচাত ভাই আক্বীলসহ অনেক আত্মীয়স্বজনকে বন্দি করেছেন, তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছেন। নবীজির সাহাবীগণকেও নিজের বাবার বিরুদ্ধে, ছেলের বিরুদ্ধে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছে। কারণঃ আত্মীয় হলেই কেউ ওয়ালী হয়ে যায় না। আত্মীয়তার চেয়ে দ্বীন বড়। আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয় রক্তের বন্ধনে আর আর আল-ওয়ালা তথা মিত্রতা গড়ে উঠে ঈমানের ভিত্তিতে। তাইতো হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

وعن أبي عبدالله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ :سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ جِهارًا غيْرَ سِرٍّ يَقُولُ : إِنَّ آلَ بَني فُلانٍ لَيسُوا بأَوْلِيائي،

إِنَّما وَلِيِّي اللهَ وصالحُ المُؤْمِنين، ولَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّها بِبِلالِها مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، واللَّفظُ للبُخاري.

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স্ব রাঃ বলেন আমি শুনেছি, রাসূল সাঃ নিম্নস্বরে নয় বরং (কিছু আত্মীয়স্বজনকে উদ্দেশ্য করে) উচ্চস্বরে বলেছেনঃ অমুক পরিবার আমার ওয়ালী (মিত্র বা আপন) নয়। আমার ওয়ালী হলেন আল্লাহ্ আর সৎ মুঅমিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তা আছে, তাদের গায়ের পানির ছিটা আমার গায়েও লাগে (মানে দুনিয়াবী ব্যাপারে তাদের কষ্টে আমিও কষ্ট পাই) (বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলো বুখারীর।)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে..

رواه مسلم (976) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ،وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে প্রভূর কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। পরে আমি মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়ে ছিলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। (সাহীহ মুসলিমঃ ৯৭৬)

বিঃ দ্রঃ= কবর যিয়ারত অর্থ করব দেখতে যাওয়া। করব যিয়ারতের মূল উদ্দেশ্য দোয়া নয়, কারন দোয়া যেকোনো জায়গা থেকেই করা যায়। হাদীছের বর্ননা মতে কবর যিয়ারতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে..

- নিজের অন্তরকে কোমল বানানো
- দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক দুর্বক করা
- মরনের কথা স্মরণ করা
- চুখ দিয়ে পানি ঝরানো
- আখেরাতের কথা স্মরন করা, ইত্যাদি।
- আর এসব লক্ষ্য হাসিলের জন্যই নবী সা. রাতে একা একা কবরে যেতেন এবং দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে...

عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মুঅমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার সন্তান থেকে, তার পিতামাতা থেকে এবং অন্য সকল মানুষ থেকে অধিক ভালোবাসবে। (মুসলিম, ইমাম বুখারী আবু-হুরাইরাহ থেকে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।)

উদাহরণঃ ৩. ইবরাহীম আঃ আল্লাহর খালীল হওয়া সত্ত্বেও আপন পিতার মাগফিরাতের জন্য কিছুই করতে পারেননি। বরং দোয়া করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিপদে পড়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4)

(কাফির আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে) তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মাঝে। যখন তারা নিজেদের জাতিকে বলেছেঃ "আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর যত খোদা আছে এদের সকলের থেকে দায়মুক্তির /সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা করলাম। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম, তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ লেগেই থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে"।

তবে ইবরাহীমের একটি কথা (তোমাদের জন্য আদর্শ নয়। আর তা হলো) ইবরাহীম তার পিতাকে বলেছিলঃ "আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করব, যদিও আল্লাহ থেকে তোমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই"। (তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়ে ইবরাহীম বলেছিল) হে রাব্ব! আমি তোমার উপর তাওয়াক্কুল করলাম, তোমার দিকে ধাবিত হলাম আর সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হয় শুধু তোমার কাছেই। (৬০ মুমতাহিনাহঃ ৪)

উদাহরণঃ ৪. কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কোনো মুঅমিনের আত্মীয় হলেও ওয়ালী হতে পারে না। তাই এমন আত্মীয়স্বজন মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। ইরশাদ হচ্ছে..

পটভূমিঃ চাচা আবু-তালিব তখন মৃত্যু শয্যায়। খবর পেয়ে রাসূল সাঃ হাজির হলেন। আবু-জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়্যাহ আগ থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। রাসূল সা. বললেনঃ চাচা! বলুনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এমন সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সাক্ষী হতে পারব। আবু-জাহেল ও আব্দুল্লাহ বললঃ আবু-তালিব! আপনি আব্দুল-মুত্তালিবের আদর্শ ত্যাগ করবেন? রাসূল সা. বারবার একই কথা বললেন। আবু-জাহেল ও সমান কথা বলল। শেষ পর্যন্ত আবু-তালিব তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। তার সর্বশেষ কথা ছিলঃ তিনি আব্দুল-মুত্তালিবের আদর্শে অবিচল। রাসূল সা. বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করব, যতক্ষণ না আমাকে বারণ করা হয়। (কুরতুবীঃ মুসলিম) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়..

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)

কোনো নবী অথবা মুঅমিন যেন কোনো মুশরিকের জন্য মাগফিরাত কামনা না করে, যদিও এরা তার আত্মীয় হয়, যখন (কুফরের উপর মৃত্যুর মাধ্যমে) পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা জাহান্নামের বাসিন্দা। (৯ তাওবাহঃ ১১৩)

আইন ও বিধানঃ কোনো মানুষ যদি কুফর বা শিরক করে এবং তাওবাহ না করে এর উপর মারা যায় তবে তার জন্য দোয়া করা (নবী, অলী বা সাধারণ মুসলিম কারো জন্যই) বৈধ নয়। করলে পাপ হবে, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা হবে। তাই সাবধান! বন্ধুগন! সাবধান!!

অনুচ্ছেদঃ ১১. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা

আমাদের উপর আরো একটি নৈতিক ও আদর্শিক ফরজ দায়িত্ব হলো আল্লাহ্ ও রাসূলকে অধিক ভালোবাসা। মুঅমিন হতে হলে আল্লাহ্ ও রাসূলকে অন্য সকলের এবং সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসতে হবে। অন্যকাউকে বা অন্যকিছুকে আল্লাহ্, রাসূল বা দ্বীনি কাজের চেয়ে বেশী ভালোবাসলে মুঅমিন হওয়া যায় না, মুঅমিন থাকাও যায় না। বরং ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165)

কিছু মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ করে। তারা এদেরকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমনভাবে ভালোবাসা উচিত ছিল আল্লাহকে। তবে যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা হয় এরচেয়ে আরো মজবুত। (কারণ অন্যরা তাদের খোদার জন্য জীবন দিতে রাজি হয় না। কিন্তু মুঅমিনরা আল্লাহর জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেয় অকাতরে। মানুষকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ মাঝে মাঝে আযাব দেন। বন্যা, সুনামী, ভূমিকম্প, হ্যারিকেন, টর্নেডু, ইত্যাদি) আযাব দেখার পর পাপিষ্ঠরা যদি বুঝত "সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ্" আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। (২ বাক্বারাহঃ ১৬৫)

অন্য আয়াতে এসেছে

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

(হে নবী! তোমার উম্মতকে) বলে দাও! তোমাদের বাবা-মা, তোমাদের ছেলেমেয়ে, তোমাদের ভাইবোন, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, যে সমপদ তোমরা নিজ হাতে অর্জন করেছ, তোমাদের নিজের ব্যবসা; যার লোকসানে তোমরা শঙ্কিত থাকো, তোমাদের ঘরবাড়ী যা তোমরা খুব পছন্দ কর, (এসব) যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে যায় তবে অপেক্ষা কর; আল্লাহ তোমাদের উপর তার আযাব পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর (জেনে রাখো!) আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে।) (৯ তাওবাহঃ ২৪)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসা কুফর।

- কোনো ব্যাপারে ইসলামী বিধানের চেয়ে কুফুরী বিধানকে বেশী পছন্দ করা কুফর।
- ইসলামী বিধানের চেয়ে অন্য বিধানকে উত্তম মনে করা কুফর।
- মনগড়া কোনো বিধানকে আল্লাহর বিধানের সমান মনে করা কুফর।
- আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল বা আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বেশী ভালোবাসা কুফর।
- যে মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে যায় সে আর মুঅমিন থাকে না বরং চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যায় আর তার সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তখন তার জানাযায় শরীক হয়া বা তার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায় (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ তাওবাহর ৮৪ তম আয়াতে)

অনুচ্ছেদঃ ১২. দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া

আমাদের উপর যেসব বিষয়কে ফরজ করা হয়েছে এসবের অন্যতম একটি নৈতিক ও আদর্শিক ফরজ হলো দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। মুঅমিন হতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে অবশ্যই আল্লাহর দ্বীনকে এবং আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এতে যারা অন্যথা করবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (39)

যে ব্যক্তি (আল্লাহ ও রাসূলের) অবাধ্য হবে, দুনিয়ার জীবনকে (আখেরাতের/দ্বীনের উপর) প্রাধান্য দেবে, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। (৭৯ নাযিয়াতঃ ৩৭-৩৯) (দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ)

অন্যত্র বলা হচ্ছে..

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (17) إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ (19)

বস্তুত তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো, অথচ আখেরাত হলো উত্তম ও চিরস্থায়ী। নিশ্চয় এসব (কথা লিখা রয়েছে) আগেকার কিতাবসমূহে, (বিশেষ করে) ইবরাহীম ও মূসার কিতাবে। (৮৭ আ'লাঃ ১৬-১৯)

আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশী ভালোবাসার পরিণতি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে..

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107)

এটা (তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব) এ জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসত (যে বা যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসে তারা কাফির হয়ে যায়) আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে।) (১৬ নাহ'লঃ ১০৭)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আমাদের সমাজে অনেকেই দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন। দুনিয়ার স্বার্থ এবং আখেরাতের স্বার্থ একত্রিত হলে তারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আসলে এমন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়। ফলে তারা সৎপথ খোঁজে পায় না।